ক্যালাইডোস্কোপ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

সম্পাদকের নিবেদন

এই গ্রন্থের প্রথম রচনা 'ক্যালাইড্যাস্‌কোপ' থেকে গ্রন্থেরও নামকরণ। 'ক্যালাইড্যাস্‌কোপ' অর্থাৎ 'বিচিত্র ছক'। পরিব্রাজক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জীবনের দ্বিতীয় শৈশবে পেঁছে প্রথম শৈশবের সেই খেলনাটি নিয়ে আবার যেন খেলতে বসেছেন। সাঁওতাল পরগণায় তাঁর পৈতৃক বাসভবন 'গঙ্গাপ্রসাদ হাউস'। সেখানে নানা কৌতূহল নিয়ে আসা আগন্তুক দর্শক দল, সে বাড়ির মালি, কেয়ার-টেকার প্রভৃতি মানুষজনের চরিত্র ও ঘটনার বিচিত্র দিক তাঁর এই লেখার উপজীব্য। এক একটি চরিত্র বা ঘটনা যেন ক্যালাইড্যাস্‌কোপের এক একটি উজ্জ্বল রঙীন নক্‌সা।

কিন্তু 'ক্যালাইড্যাস্‌কোপ' ছাড়াও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে আরও বহুতর মানুষের কথা। সেই সব মানুষদের লেখক পেয়েছেন তাঁর চলমান পথিক জীবনে। পরিব্রাজকের চির উদাসীন জীবনে যে সব মানুষ ছায়া ফেলে গেছেন, যাঁরা তাঁর স্মৃতির মেঘরাজ্যে বিদ্যুত-লতার মত মাঝে মাঝে দীপ্তিদান করে, সেইসব মানুষের কথাই এই গ্রন্থের নানা গল্পের সারাৎসার।

'স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে।'—এই রবীন্দ্র উক্তি এক্ষেত্রেও সত্য। পর্যটক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও এখানে তাঁর অলক্ষ্য স্মৃতির দৃষ্টি গ্রাহ্য ছবিই শুধু লিখেছেন, ইতিহাস বা আত্মচরিত নয়।

—অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়

২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৮
"বনশ্রী"
মধুপুর / সাঁওতালপরগণা।

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

তপোভূমি মায়াবতী
কৈলাস ও মানসসরোবর
মনিমহেশ
ত্রিলোকনাথের পথে
কাবেরী কাহিনী
গঙ্গাবতরণ
কুয়ারী গিরিপথে
পঞ্চকেদার
শেরপাদের দেশে
আফ্রিদি মুল্লুকে
বৈষ্ণোদেবী ও অন্যান্য কাহিনী
পালামৌর জঙ্গলে
দুই দিগন্ত
জলযাত্রা
অ্যালবাম
অ্যালবাম পুনশ্চ
আলোছায়ার পথে
মুক্তিনাথ

বিষয়সূচী

ক্যালাইড্যাস্‌কোপ ১
একটি জীর্ণ নোট বই ও ঘরোয়া কাহিনী ৪৮
সেকালের সমাজের বিধি ও দেশাচার ৬৪
মুকুন্দদাস ৭২
নিরুদ্দেশের সন্ধানে ৭৯
কি কথা ছিল যে মনে ৯০
মায়াডোর ৯৪
বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো ৯৯
পরানদা চলে গেলেন ১০২
হঠাৎ আলোর ঝলকানি ১১০
ভ্রমণ তখন আর এখন ১১৫
অভিযাত্রী ১২৪
পাগলীর পায়স ১২৮

মধুপুরের গঙ্গাপ্রসাদ হাউস

ক্যালাইড্যস্‌কোপ

।। এক ।।
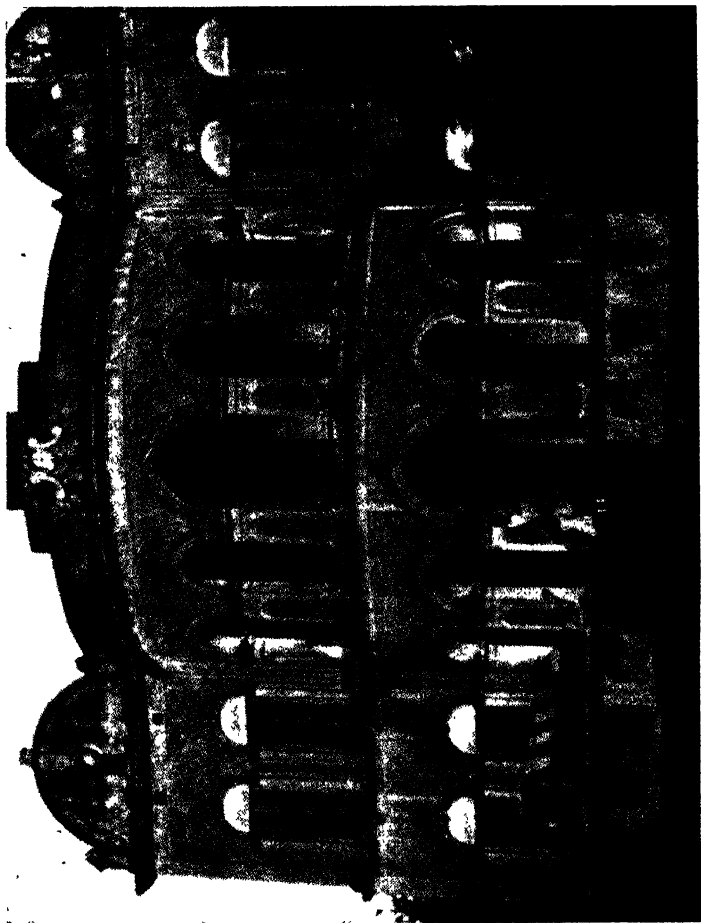
ক্যালাইড্যস্‌কোপ—উচ্চারণ ঠিক হবে কিনা জানি না। ইংরেজি হরফে লিখলে শব্দটি kaleidoscope। ইংরেজি বই-এ ও রচনায় মাঝে মাঝে এটির প্রয়োগ দেখা যায়। এই উৎকট শব্দটি শিখিও তাই থেকে। অথচ, যে বস্তুটির এটি নাম, তার সঙ্গে খুবই পরিচয় ছিল সেই ছেলেবেলাতে—একটা বিচিত্র খেলার সামগ্রীভাবে। তখন আমাদের ভাষায় সেটা কী বলতাম আজ মনে নেই, তবে ওই বিকট ইংরেজি নামে অবশ্যই নয়। আজকাল ছেলেদের হাতে এটা দেখি না। যদি পাঠকদের কারও জানা না থাকে, বস্তুটির এখানে বর্ণনা দিই। বিঘৎখানেক লম্বা একটা পিজবোর্ডের গোল চোঙা। একালের পঞ্চাশ নয়া পয়সার প্রায় দ্বিগুণ ব্যাস। চোঙার বাইরেটা সাধারণত লাল, নীল বা সবুজ রঙের ফুলকাটা কাগজে মোড়া। দুদিকের গোল মুখ মোটা কাঁচ লাগিয়ে বন্ধ, —একদিকে তেকোণা তিনটে ঘষা কাঁচ জুড়ে, অপর দিকেরটার একটা

গোল স্বচ্ছ কাঁচ। সেই স্বচ্ছ কাঁচে চোখ লাগিয়ে দেখলে ভিতরে অপর দিকের ঘষা কাঁচের গায়ে দেখা যায়, নানারঙের কাঁচের টুকরো গায়ে গায়ে লেগে জড় হয়েছে এবং চোঙাটা চোখে রেখে ক্রমাগত ঘোরাতে থাকলে সেই সব বিবিধরঙের কাঁচের টুকরাগুলিও ঘুরে ফিরে গায়ে গায়ে লেগে যায়,—চোঙার ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে বর্ণবৈচিত্র্যও যেমন ঘটতে থাকে, তেমনি নতুন নতুন নানান আকৃতির আবির্ভাব হয়। একা একা বসে সেই চোঙা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে ভারি মজা লাগত—কতো নানা রঙের বিচিত্র খেলা—ওই একটুকু চোঙার মধ্যে। এই কারণেই শব্দটির আভিধানিক পরিভাষা হয়েছে,— বিচিত্রদৃক্,—অর্থ লেখা আছে, "ইহার মধ্যে চাহিলে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল সুন্দর বর্ণ ও মূর্তি দেখা যায়"।

এখন হাতে আমার সেই খেলার বস্তুটি নেই, তবে জীবনের এই দ্বিতীয় ছেলেবেলায় একই জায়গায় বসে চোখ মেলে দেখছি—কতো বিচিত্র সব মানুষের আনাগোনা, তাদের আচার ব্যবহার। যেন, রঙ্গমঞ্চে নাটক দেখা।

প্রথমে তারই পটভূমির বর্ণনা দিই।

সাঁওতাল পরগনা। মধুপুর। বাড়ির নাম গঙ্গাপ্রসাদ হাউস্।

এ বাড়ি তৈরি করান পিতৃদেব। ১৯১২ সালে। বাড়ির নামকরণ হয় তাঁর পিতা গঙ্গাপ্রসাদের নামে। বিঘা দশবারো জমি। বাড়ির দু'পাশে আম, জাম, আতা, পেয়ারা বেল, লিচু প্রভৃতি নানান ফলের বাগান। মহুয়া, পলাশ, শিরীষ, সেগুন, নিম, তেঁতুল এ-সব গাছও আছে। সামনে ফুলের বাগান। রাস্তার ধারে পাঁচিলের পাশে সারি সারি ইউক্যালিপটাস গাছ—যেন সঙ্গীন-কাঁধে প্রহরী দল।

১৯১২ সালে এ-বাড়ি তৈরি হলেও আমাদের মধুপুরে যাতায়াত তারও আগে থেকে। নিজেদের বাড়ি হওয়ায় মধুপুর হয়ে যায় যেন আমাদের আপন দেশ। টানে যেন নাড়ির টানে। স্কুল-কলেজের ছুটি হলেই সেখানে যাওয়া চাই-ই। এমন কি দু'তিন দিনের ছুটিতেও ঘুরে আসা,—রেলের উইক্-এন্ড টিকিট কেটে। আর, বাড়ির কেউ অসুখ বিসুখে ভুগলে সেখানে গিয়ে মাসের পর মাস কাটানো—বলা হোত 'চেঞ্জে' যাওয়া। শুধু আমাদেরই সেভাবে যাওয়া নয়, বহু বাঙালী তখন সেই উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়িতে বা বাড়ি ভাড়া নিয়ে সাঁওতাল

পরগনায় গিয়ে থাকতেন। স্থানীয় লোকেরা তাদের বলত,—চেঞ্জার-বাবুরা। সেই নতুন বাড়ি—গঙ্গাপ্রসাদ হাউস-এর—গৃহপ্রবেশের এবং সেকালের কিছু কিছু ঘটনার বর্ণনা আছে মেজদার (শ্যামাপ্রসাদের) ডায়েরীতে, আমারও দু'একটা রচনায়।

ছোট শহরে সেই দোতলা গঙ্গাপ্রসাদ হাউস দেখতে লাগে এক বিশাল প্রাসাদ। লাল রঙ। আদিম সাঁওতাল পরগনার রুক্ষ শুষ্ক লালমাটির দেশের যেন লাল বর্ণ গায়ে মেখে বাড়িও হয়েছে লাল। দিগন্ত বিস্তৃত ধুধু করে উঁচু নিচু ঢেউ-খেলানো মাঠের পরে মাঠ। তারই বুকে মাঝে মাঝে ধানক্ষেত। বহু দূর থেকেও বাড়িটাকে দেখা যেত,—যেন শুষ্ক সরোবরে যাদুবলে ফুটে থাকা একটি লালপদ্ম! —এসব সেকালের দৃশ্য। এখন সভ্যতার বিস্তারে শহর বড়। এখানে ওখানে কলকারখানা। উদ্ধত-শির চিমনি কালো ধোঁয়ায় নীল আকাশ মলিন করে।

এই বাড়ির বিশালতা দেখেই, শুনেছি, এক কবি তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখেছেন. এ বাড়িতে ৪২টা ঘর। হয়ত গেটের বাইরে সামনের বড় রাস্তা থেকে দেখে বাড়ির চারপাশের বড় বড় দরজাজানলা-গুলি গুনে তাঁর সেই ধারণা। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, ঘরের সংখ্যা বাড়ির আকারের অনুপাতে অল্পই। প্রতি ঘরেই কয়েকটাই জানালা দরজা। ঘরগুলিও যেমন উঁচু তেমনি লম্বাচওড়া—হল্ ঘরের মত। দালান বারান্দাও তেমনি বড়। মধুপুরের এই দোতলা বাড়িতে কদিন কাটিয়ে কলকাতায় ভবানীপুরে আমাদের সাবেক পৈতৃক চারতলা বাড়িতে ফিরে এসে মনে হোত যেন বনের পাখি খাঁচায় বন্দী হোল! মধুপুরের বাড়িতে অতো বড় বড় ঘর ও অতোগুলি জানালা দরজা থাকার উদ্দেশ্য যাতে ঘরে ঘরে আলো বাতাস অপর্যাপ্ত ও অবাধ প্রবেশ করতে পারে।

অথচ, সেই বিশাল গঙ্গাপ্রসাদ হাউসেও পিতৃদেবের জীবনকালে পুজার ছুটিতে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, উকিল ব্যারিস্টার, পণ্ডিত অধ্যাপক ডাক্তার, আমাদের শিক্ষক এতো অতিথি-অভ্যাগতের বিরাট সমাবেশ হোত যে লোকজনে সারা বাড়ি উপচে উঠত। আমি গিয়ে থাকতাম তিন তলার ছাদে সিঁড়ির ওপর চিলেঘরে,—আমার সে যেন বিশাল গাছের মগডালে পাখির বাসা বাঁধা! —সেখানেও অবশ্য চার-

পাশেই দরজাজানালা।

পরবর্তীকালে, বড়দা, মেজদাদের আমলেও বাড়িতে অমন উপচে-পড়া লোকজন না হলেও বেশ জমজমাট ছিল। সকলের যাতায়াতও ছিল—প্রতি বছরেই। মেজদার কাশ্মীরে বন্দিদশায় অকস্মাৎ মৃত্যুর পরও বড়দাদা যতোদিন না শয্যাশায়ী হলেন নিয়মিত যেতেন, কিছুদিন সেখানে কাটাতেনও। কালক্রমে, তাঁর যাওয়া আর সম্ভব হোত না। বাড়িও প্রায় খালি পড়ে থাকে। ক্বচিৎ কখনো কেউ দিনকয়েক কাটিয়ে আসেন। ও-সব অঞ্চলে অবশ্য বাড়ি কোন সময়েই একেবারে খালি ফেলে রাখা চলে না। তাই, বাড়ির 'কেয়ার-টেকার' সেই প্রথম যুগ থেকেই একজন কাউকে রাখার ব্যবস্থা হয়। তাছাড়া, মালী ত' থাকেই।

ওদিকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমারও পাহাড়ে ঘোরাফেরা কমাতে হয়। এবং কোথাও ঘুরতে গেলে—বিশেষত শীতকালে—মধুপুরের সেই শূন্য বাড়িই হয় আমার নিভৃত আশ্রয়। থাকি একা। স্বকীয় ব্যবস্থাপনে—স্বাবলম্বী হয়ে। দোতলার একটা ঘরে। তবে ওপরের সব ঘরগুলি প্রতিদিনই খুলে পরিষ্কার করে রাখা হয়। এইভাবে একা থাকা আমার আজন্ম প্রকৃতি। এর এক অপূর্ব আনন্দস্বাদ থাকে।

বাড়ির একতলায় রান্নাঘরের পাশে কোণের একটা ঘরে 'কেয়ার-টেকার' থাকে। আর, মালীর বাড়ী নিকটে। সে আসে যায়। রাত্রে এ-বাড়িতে একতলায় ভেতরের দালানে শোয়।

আমার যখন ওইভাবে মধুপুর-বাস শুরু, তখন 'কেয়ার-টেকার' ছিলেন এক বাঙালী। প্রথম এসেছিলেন যখন সেসময় তিনি তরুণ যুবক। দেশবিভাগের পর নিরাশ্রয় হয়ে বড়দার কাছে আসেন। বাড়ির পিছন দিকে স্বতন্ত্র একটা 'আউট হাউস'-এ থাকতেন। এখানে একটা চাকরিও পেয়ে যান। পরে বিবাহ করলেন। সন্তানাদিও হোল। পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মধুপুরে অন্যত্র নিজের বাড়ি করে সেখানে চলে যান।

তারপর এল কেয়ার-টেকার হয়ে এক বিহারী। স্থানীয় এক দপ্তরে চাকরি করে। বয়েস হয়েছে। নিচের সেই একতলার কোণের ঘরটিতে থাকে স্ত্রীকে নিয়ে। নাম—বাসুদেব, —লোকমুখে বাসদেও। লোকটি শান্ত প্রকৃতি। কর্তব্যপরায়ণ। বিশ্বাসী। স্বামীস্ত্রী দুজনেই ধর্মভীরু। মাঝে মাঝেই দেখতাম, নিচে পুরুত এসেছে। পুজাপাঠ

হচ্ছে। কিছু পরে তার বুড়ি বৌ উপরে আসে। ছোট রেকাবি করে ফলবাতাসা প্রসাদ দিয়ে যায়। বুড়ি বৌ লিখলাম বটে, কিন্তু তার মাথাভরা সাদা চুল ও পাকাটির মত চিমড়ে গড়ন নিয়ে দিনরাত কী পরিশ্রমই না করত। বাড়ি থেকে কিছুদূরে বাগানে কুয়াতলা। সেইখান থেকে দু'হাতে দু বালতি জল বাড়ির মধ্যে তার ঘরে আনতে দিনে কতোবারই দেখা যেত! আর, বাসদেও শেষের দিকে যখন বয়সের ভারে তার দেহ কুঁজো হয়ে গেছে, তখনও দেখতাম, বাগানের মাঠে খুরপি হাতে বসে বসে একমনে মাটি খুঁড়ছে, কিছু সবজি বা ফসল ফলাবে। ধৈর্য ধরে ওই ভাবে খেত তৈরি করে ফসলও ফলাত।

কিন্তু, সৎ লোকেরও মনের বুদ্ধির জমিন কী সব দিক থেকে তেমন তৈরি হয়? তারই এক ঘটনা বলি।

বড়দিনের ছুটি হলে ভাইপোরা আসতে পারে জানিয়েছে।

আমি একা থাকি। নিজের খাওয়াদাওয়ার জন্যে প্রয়োজন অতি অল্প, সেইমত জিনিসপত্রও অল্পই থাকে। ভাবি, ওরা এলে সে-সময়ে নতুন চাল উঠবে, পুরানো ডাল চাল যদি তখন না পাওয়া যায় দোকান থেকে খবর আনাই।

বাসদেওকে ডেকে বলি, যখন বাজারে যাবে মুদি কানাই সা'কে জিজ্ঞাসা করে এস সেই চালটা পাওয়া যাবে কিনা ও এখন দাম কতো?

দিন চারেক কেটে যায়। বাসদেও অন্য কাজে আমার কাছে আসেও, কিন্তু কি জেনে এল, আমাকে জানায় না। আমিও তাড়াতাড়ি নেই বলে জিজ্ঞাসা করি না। ভাবি, ভুলে গেছে জেনে আসতে, পরে আবার একদিন মনে করিয়ে দিলেই হবে। বেচারী ভাল মানুষ, ভুলো মনও একটু।

দিন দশেক পরে একটা দরকারী কাজ সময়মত করতে সে ভুলেছে। আমি তাকে মৃদু তিরস্কারের সুরে অভিযোগ জানাই, বাসদেও, তোমাকে যা করতে বলা হয়, মাঝে মাঝেই ভুলে যাও। এই দেখ, সেদিন তোমাকে কানাই সাহার ওখানে চালের খবর জেনে আসতে বললাম, তুমি আজ পর্যন্ত জেনে এলে না!

বাসদেও আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকায়। নম্র প্রতিবাদ করে জানায়, না বাবুজি, ওটা তো আমার ভুল হয়নি, সেইদিনই আমি কানাই সা'র কাছে জেনে এসেছি।

আমি তখন বলি, জেনে এলে তো খবরটা আমাকে এতদিন জানাতে ভুলে গেছ!

সে এবার প্রকৃতই অবাক হয়ে আমাকে উত্তর দেয়, আপনি তো খবরটা শুধু জেনে আসতেই বলেছিলেন, আপনাকে এসে জানাতে তো বলেননি!

তার এই সরল উত্তরে আমি হেসে ফেলি। স্বীকার করি, হাঁ, তা ঠিক।

সেই বাসদেও তার অফিসের চাকরি থেকে রিটায়ার করার পরও বছর দুই এখানেই থাকে—অবসরগ্রহণের পর তার প্রাপ্য টাকাকড়ি পাওয়ার আশায়। কিন্তু, অনেক ঘোরাঘুরি করেও তার প্রাপ্য পুরা টাকা পায় না। ওদিকে তার শরীরও দিন দিন ভেঙে পড়ে, বার বার রোগে ভোগে। আমি সে সময়ে মধুপুরে নেই। খবর পেলাম, অফিস থেকে তার পাওনা বাকি টাকার আশা আপাতত ত্যাগ করে একদিন তারা স্বামীস্ত্রী দেশে চলে গেল। তার ধারণা, বেশিদিন সে আর বাঁচবে না, আপন গ্রামের নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের তার একান্ত আগ্রহ। আপাতত বিহারী অপর একজনকে কেয়ার-টেকার ভাবে রাখার ব্যবস্থা হয়।

এর প্রায় বছর দেড়েক পরের কথা। আমি তখন আবার মধুপুরে। হঠাৎ একদিন বাসদেও-র স্ত্রী এসে হাজির। বাসদেও-র খবর জিজ্ঞাসা করতেই কেঁদে ফেলে,—মাস দুই হোল মারা গেছে। পেনশনের প্রাপ্য টাকা? না, গাঁও থেকে বারবার লিখেও আর কিছু আদায় হয়নি। এখন তাই অপুত্রক বিধবা এসেছে—যদি দপ্তর থেকে টাকাটা পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় সব কিছু কাগজপত্র সঙ্গে এনেছে।

সেই টাকার একটা চেক তারপর সে পেয়ে যায় বটে,—তবে সে-যাত্রায় নয়, বার দুই আবার এসে কয়দিন ধরে অনেক ঘোরাঘুরির পর!

॥ দুই ॥

গঙ্গাপ্রসাদ হাউস-এর নতুন কেয়ার-টেকার আসার পর প্রথম যেবার সেখানে গিয়ে থাকি তার প্রথম দিনের এক ঘটনা বলি।

বিকেলবেলা পেঁৗছেচি। কেয়ার-টেকার স্টেশনে এসেছিল। বয়স

বছর ত্রিশেক হবে। শুনলাম, স্কুল ফাইনাল পাশ। তার সংসারটি দেখলাম ওখানে থাকার পক্ষে বড়। স্ত্রী ও একটি ছোট ছেলে আছে। তাছাড়া, শাশুড়ি ও এক ভগিনী। আবার, এক ভাইও।

আমি সেদিনই তাকে জানাই, বাপু, এতো লোকজন নিয়ে তোমার এখানে থাকা চলবে না। সে তখনি জানায়, এতজন থাকবে না, শুধু বৌ, আর লেড়কা থাকবে, আর সব বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। তবে, ভাইটাকে কিছুদিন কাছে রাখতে হবে। এখানে স্কুলে পড়ছে, আমার কাছে না থাকলে ঠিকমত পড়াশুনা করবে না, শাসনেও থাকবে না।

প্রথম দিন। তাই আমি আর কিছু তখন বলি না। ভাবি, পরে দেখেশুনে যথাবিহিত ব্যবস্থা করতে হবে।

সেইদিনই সন্ধ্যার পর। দোতলার ঘরে জিনিসপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে বসেছি। ইদানীং ট্রেন যাত্রায় আনন্দ নেই, কষ্টভোগই হয়। যাত্রাশেষে ডেরায় পৌঁছে এখন নিশ্চিন্ত মনে আরামে বসা। বাইরে আবছা আঁধার। নিঝুম নিস্তব্ধ। সাঁওতাল পরগনার সেই চির আকাঙ্ক্ষিত শান্তিময় আবহাওয়া। হঠাৎ সেই নিঃশব্দতা ছিন্নভিন্ন করে জানলার নিচে, বাগানে কার যেন রাগত কণ্ঠে ধমকানি,—আও ইধার—কাঁহা গিয়াথা—চলো আজ তুমকো সায়েস্তা করে গা—চলও, চলও—

বুঝতে পারছি, ভাইটা সন্ধ্যের পরও কোথাও ছিল, এখন তাকেই দাদা ধরে নিয়ে চলে,—তার ভাগ্যে আজ শাস্তি আছে।

'আও-আও-ইধার'—রাগত কণ্ঠ, জানলার নিচে থেকে সরে গিয়ে বাড়ির পিছন দিকে খিড়কি পানে এগিয়ে চলে। বোঝা যায় ভাইটা ভয়ে যেতে চাইছে না, দাদা টানতে টানতে নিয়ে চলে। তার পরই—সপাং সপাং মারের আওয়াজ!—আহা! ভাইটা মার খাচ্ছে—মুখ বুজে সইছে বেচারী!—এলাম এখানে নিরালায় শান্তিতে কাটাতে,—এ কী অশান্তি! বিরক্তি জাগে। জানলার কাছে উঠে যাই, ভাবি বারণ করব—ওভাবে মারতে।—ছায়ার মত দূরে ওদের দেখা যায়। আবার, ধমকানি,—'ফিন্ উধার কাঁহা ভাগ্তা'—জোর সপাং শব্দ!

এবার সঙ্গে সঙ্গে মিহিগলায় আর্তনাদ—ভ্যা-ভ্যা-ভ্যা!

কেয়ার-টেকার আমায় জানায়নি,—তার সংসারে দুটা ছাগশিশুও আছে।

* * *

সেই বিশাল গঙ্গাপ্রসাদ হাউস-এ আমার সঙ্গীবিহীন নিভৃত বাসের প্রথম পর্বে প্রকৃতই জনসম্পর্কশূন্য একাকী থাকা। তবুও, মুহূর্তের জন্যও কখনও একাকিত্ব বোধ হোত না। মালী প্রতিদিন সকালে দোতলায় জল তুলে দিয়ে যায়। সে বা তার বৌ বা ছেলে এসে ঘর-গুলিতে একবার ঝাঁটাও বুলিয়ে দেয়,—ঠিকভাবে পরিষ্কার না হলেও কিছু বলি না। পরে নিজেই করে নিই। কারও সঙ্গে কথা বলার কোন প্রয়োজনও বড়-একটা রাখি না। আপন মনে নিজের কাজকর্ম করে যাই। যেন, আমিই মনিব, আবার, আমিই তার সেবক। অথচ, কাজ আর কতোটুকু। মধুপুরে সপ্তাহে দুদিন হাট বসে। কখন-সখন হাটে গিয়ে আমার প্রয়োজনমত শাকসবজি নিজেই নিয়ে আসি। দুদিনের সওদায় এক সপ্তাহ কেটে যায়। রেডিও, ট্রানজিস্টার কোন কিছু রাখি না, খবরের কাগজও পড়ি না। সঙ্গী শুধু বই ও আপন মন। নিস্তরঙ্গ দিনগুলিও নিঃশব্দে বহে যায় কোথা দিয়ে!

প্রথম প্রথম নিচে নেমে বাগানে পায়চারি করতাম, পরে নিচে নামাও ছেড়ে দিই। দোতলায় বারান্দায় বা ছাদে ঘুরে ফিরেই ভ্রমণের আনন্দ পাই। সেখান থেকেই দেখি, বাড়ির সামনের বড় রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে লোকজন চলে। পূজার বা বড়দিনের ছুটিতে বাঙালীর সংখ্যা বাড়ে। অনেকেই বাড়ির দিকে তাকান। কেউ কেউ গেট খুলে কম্পাউন্ডে ঢুকে সামনের বাগানে ঘুরে ফিরে চলে যান। সামনের দিক থেকে বাড়িতে ঢোকার পথে উঁচু রোয়াক। কয়েকটি ধাপ উঠে খোলা চাতাল। দু পাশে মার্বেল-বসানো হেলান দিয়ে বসার লম্বা সীট। তারপরেই ঢাকা বারান্দা। সেইখানে বাবার প্লাস্টার-অব-প্যারিসের আবক্ষ মূর্তি। সোনালী রঙ করা। সুমুখের বাগান থেকে ত বটেই, বাইরের রাস্তা থেকেও এটি দেখা যায়।

যাঁরা বাগানে ঢোকেন, তাঁদের অনেকেই ধাপ বেয়ে উঠে এই মূর্তির নিকটে গিয়ে দেখেনও। প্রথম যুগে ওপর থেকে দেখেছি, তাঁদের দু'একজন চাতালে জুতা খুলে এগিয়ে যান। বোঝা যায়, তাঁরা সেকালের লোক। এই মূর্তি যে সিমেন্টের স্তম্ভের ওপর বসানো,—তার গায়ে কেউ কেউ পেনসিল বা কালি, অথবা খড়ি দিয়ে নিজ নিজ নাম, ঠিকানা, তারিখ লিখে গেছেন।

এই মূর্তি সম্পর্কে দুটি ছোট্ট ঘটনা বলি। অবশ্য হাল আমলের।

একবার গিয়ে দেখি, মূর্তির চোখ দুটির ঠিক মধ্যিখানে খানিকটা গর্ত করা। কি করে হোল ভেবে পাই না। প্লাস্টার-অব-প্যারিস দিয়ে সেটা বুজিয়ে সোনালী রঙ করে দেওয়া হয়। পরের বছর গিয়ে দেখা যায়, আবার সেই গর্ত! আবার সেটা বোজাতে হয়। মানুষের কীর্তি, সন্দেহ থাকে না। কিন্তু, কেন করে? হেঁয়ালি হয়ে থাকে। কয়েকদিন পরে হঠাৎ-ই এই কুকর্মের কারণ জানতে পারি। বিকেল বেলা। জনতিনচার স্থানীয় ছোকরা নিচের বাইরের সেই চাতালে উঠে ধাপের পাশে মেঝেতে বসে গল্পে মশগুল। আমি দোতলায় সামনের বারান্দায় পায়চারি করছি। নিঃশব্দে। তাদের কথাগুলি মাঝে মাঝে কানে আসছে। হঠাৎ শুনি একজন মূর্তিটি সম্বন্ধে কি যেন বলছে। রেলিং-এর ধারে আড়ালে দাঁড়াই। শুনি, সে তার সঙ্গীদের বলছে, চোখ দুটোর মধ্যে সোনা বসানো—খবরটা এক্কেবারে বাজে!

পরে, স্থানীয় বন্ধুদের কাছে এ গল্প করলে তাঁরা বলেন, জানতেন না এতোদিন? এখানকার আজকালকার ছেলেদের যে অনেকেরই ধারণা! ওই চোখ ফুটো করে তাই সোনার সন্ধান।

অপর ঘটনাটি আরও ছোট।

ওই মূর্তির পিছনের দেওয়ালের গায়ে অনেকখানি ওপর দিকে একটা ইলেকট্রিক আলো। একদিন সকালে দেখা যায়, মূর্তির কাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে কে এসে বালবটি খুলে নিয়ে গেছে!

যে ঢাকা বারান্দায় ওই মূর্তি, সেখান দিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশের সদর দরজা। আমি থাকি দোতলায়। নিচে সব ঘরগুলি খালি, তাই সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধই রাখা হয়।

প্রথম দিকে কয়েক বছর যাঁরা বাগানে ঢুকে বাড়ির আশপাশে ঘুরে দেখতেন, তাঁরা সেইভাবেই ঘুরে চলে যেতেন। সম্ভবত তাঁদের ধারণা হোত, বাড়িতে লোকজন কেউ নেই, কবাট বন্ধ।

ওপরে আমার সঙ্গে ক্বচিৎ কখন দেখা করতে আসতেন মধুপুরে দু'একজন স্থায়ী বাসিন্দা বন্ধু অথবা যাঁদের ওখানে বাড়ি আছে,—ছুটিতে তাঁরা কেউ বেড়াতে এলে। তাঁরা আসতেন পিছনের খিড়কির দরজা দিয়ে, অন্দরমহলের উঠান পেরিয়ে।

ক্রমে বছরও যেমন এগিয়ে চলে, দেখা যায়, অলক্ষ্যে কখন মধুপুরেও

হয়ে যায় ছোটখাট একটা ট্যুরিস্ট সেন্টার! স্বাস্থ্য ফেরাতে চেঞ্জার-বাবুদের স্থলে আসতে থাকেন ট্যুরিস্টরা। দু'চার দিন কাটান। ঘোরেন ফেরেন। চলে যান।

একবার এদেরই একদল এবাড়ির নাম শুনে দেখতে আসেন। কানপুরবাসী প্রবাসী বাঙালী। সপরিবার এসেছেন। আলাপ করি। জিজ্ঞাসা করি, কানপুর থেকে এখানে এসেছেন? আত্মীয়স্বজন কেউ এখানে আছেন নিশ্চয়?

ভদ্রমহিলা প্রশ্নের উত্তর দেন, না, না, এখানে আবার আমাদের কে থাকবে? আমরা দু'তিন পুরুষ ইউ পি বাসী। এখানে এলাম স্রেফ বেড়াতে। আমিই ওঁকে বললাম, এবার তোমার রাজস্থান বা দ্বারকার প্রোগ্রাম তোলা থাক। চলো মধুপুরে। উপন্যাসে, গল্পে মধুপুরের কেবল নাম পড়ি। এ বছর চল সেখানে, জায়গাটা দেখে আসা যাক। এখানে এসে উঠেছি রেললাইনের ওপারে এক ধর্মশালায়, তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। বলতে পারেন, ওরই মধ্যে একটু ভাল হোটেল-টোটেল আছে এখানে?

মহিলার মুখে তাঁদের সেই বহুখ্যাত পশ্চিমের শহর কানপুর থেকে মধুপুরে বেড়াতে আসার কথা শুনে সেদিন আমার মন মধুপুরের গর্বে প্রকৃতই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল।

এইভাবে ট্যুরিস্টদের যাতায়াতের ফলে ভাল হোটেল ও ধর্মশালাও গড়ে ওঠে। তার মধ্যে বাঙালীদের একটি বেশ ভাল ও বড় হোটেলও আছে। স্টেশনের নিকটে বিশাল এলাকা জুড়ে তার বাড়িটিও দেখতে সেকালের বিলাতী Castle-এর মতন। মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের রাজবাড়ি। দক্ষিণ কলকাতার সমর মিত্র মশাই এই বাড়িটি নিয়ে হোটেল খোলেন। বেশ চলতেও থাকে।

এদিকে গঙ্গাপ্রসাদ হাউস-এর কমপাউন্ডে লোকজনের আনাগোনাও বাড়ে। ওপরে বারান্দায় আমাকে দেখতে পেলে কেউ কেউ নিচে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, ওই তো লোক রয়েছে। ও মশাই! এ-বাড়িতে থাকেন দেখছি। কেয়ার-টেকার বুঝি?

হেসে উত্তর দিই, বাড়িতে থাকলে বাড়ির কেয়ার নেওয়ারই কথা।

আবার প্রশ্ন, বাড়ির ও'রা কেউ আসেন না?

বলি, আসেন বই কী। যাঁর যখন সুবিধে হয়।

কখন কখন আগন্তুকদের কেউ ঔৎসুক্য প্রকাশ করে বলেন, বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখা যায় না?

দোতলার পিছনে গিয়ে মালীকে ডেকে বলে দিই, বাইরের দরজা খুলে ভদ্রলোকদের নিচের ঘরগুলি দেখিয়ে দাও। ওপরে যেন এনো না।

বাড়ির মধ্যে দর্শনীয় আছেই বা কী! আছে শুধু খাঁ খাঁ করা শূন্য বিরাট ঘরগুলি। অন্দর মহলে লম্বা দালান, পাথর বাঁধানো প্রকাণ্ড উঠান, তারই দুদিকে সারি সারি ভাঁড়ার, রান্নার, পুজার, স্নানের ইত্যাদি ঘর। ভেতরের দালান থেকে দোতলায় ওঠবার চওড়া কাঠের সোপান-শ্রেণী। এ-বাড়ি যখন ১৯১২ সালে তৈরি হয়, শুনেছি, কলকাতায় সে সময়ে এক বহু পুরানো বিশাল বাড়ি ভাঙা হচ্ছিল, তারই বড় বড় দরজা জানলা কিনে এনে এখানে লাগানো হয়, কাঠের সিঁড়িও সেখানকার। সিঁড়ির রেলিং-এর হাতলে এক জায়গায় ছোট্ট করে খোদাই করা একটা সাল এখনও পড়া যায়—আঠার শ' কতো সালের!

আর, ঘরে ঘরে ও দালানের দেওয়ালে টাঙানো আছে সারি সারি ছবি ও মানপত্র। অনেকগুলি ফটোই বাবা, বড়দা, মেজদা বা আমাদের বিবিধ সময়ে কোন উপলক্ষ্যে তোলা গ্রুপ ফটো, অথবা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন সভাসমিতির অনুষ্ঠানে নেওয়া এবং মানপত্রগুলি বাবা, বড়দা বা মেজদাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়া।

দর্শকদের কেউ কেউ কখন ওপরে আসতে আগ্রহী হলে মালী এসে জানায়। আমি নিচে নেমে যাই। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে লোক বুঝে ওপরে নিয়ে আসি। তাঁরা ওপরের ঘরে ও দালানে টাঙানো পুরানো ছবি ইত্যাদি দেখেন. তাঁদের সঙ্গে আমাকে ঘুরতে হয়। নানান জনের নানান প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। তাঁদের কতোরকম মন্তব্যও শুনি।

একদিন একজন একটু ভর্ৎসনার সুরেই বলে উঠলেন, ওপরের ঘরগুলো তো দেখছি বেশ পরিষ্কার করে রাখা, —নিজে থাকেন বলে বুঝি? আর নিচে ওই দিকটায় দেখলাম যেন অনেকদিন সাফ করা হয়নি। কেয়ার-টেকার হয়ে রয়েছেন, সব ঠিকমত দেখেন না কেন?

মাথা নিচু করে জানাই, দেখার চেষ্টা করছি।

একদিন একজন কীভাবে আমার পরিচয় পেয়ে যান। ঘুরে ঘুরে দেখছেন। সঙ্গে থাকতে হয়েছে। হঠাৎ তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কতো টাকা দিচ্ছে গভর্নমেন্ট ?

প্রশ্নের মর্মোদ্ধার করতে না পেরে জানতে চাই, কীসের টাকা ?

তিনি বলেন, বাঃ। এ বাড়ি ছিল অমন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির। সংরক্ষণের জন্যে সরকার অবশ্যই বছর বছর টাকা দিচ্ছে! এতো বড় বাড়ি আজকালকার দিনে মেন্‌টেন্‌ করার খরচা তো প্রচুর।

কথাগুলি শুনে আমিও অবাক হই ভেবে, এ-মানুষ কোন্‌ জগতের!

হেসে বলি, সরকার টাকা দেবে কেন? এটা তো ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বরং উলটে গভর্নমেন্ট ও মিউনিসিপ্যালিটিকে খাজনা ও ট্যাক্স দিতে হয়। এবং তাও বাড়িয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে কোলাপসিবল গেট। দিনের বেলা শুধু টেনে বন্ধ করা থাকে। রাত্রে তালা চাবি লাগাই। ওপরে উঠেই লম্বা দালান। দালানের একধারে আমার রান্নার স্টোভ ইত্যাদি। সিঁড়ির কাছাকাছি একটা বড় টেবিল। সেইখানেই খাওয়াদাওয়া করি। দালানের অপর অংশে একটা চৌকি পাতা। দালানের দুই প্রান্তে—একদিকে স্নানের ঘর, অপর প্রান্তে পায়খানা। দালান থেকে দু দিকেই বেরিয়ে লম্বা ছাদ।

এই দালান থেকেই সিঁড়ির দুই পাশে শোওয়ার ঘরে যাওয়ার কয়েকটি দরজা। ওপরে ছাদে যাওয়ারও একই রকম কাঠের সিঁড়ি।

শোওয়ার ঘরের ভিতর যাওয়ার আগে অনেকেই নিজে থেকে জুতা খুলে ঢোকেন। কাউকে কাউকে খুলতে বলতে হয়। আবার দু' একজন জুতা খোলার অনুরোধ শুনলেই বলেন, থাক, ওদিকে আর যাব না, —এই তো ওপরে দেখা হোল।

এই দালানে ও ঘরগুলির দেওয়ালেও টাঙানো আরও ছবি, ফটো, মানপত্র। অধিকাংশ আগন্তুক সেগুলি ভাল করে দেখেন, আমাকে প্রশ্ন করেন, কার ছবি, কবেকার ছবি ইত্যাদি। আমাকে গাইড-এর কাজ করতে হয়।

অনেক বছরের পুরানো ফটো। অনেকের দেখি, সেকালের

সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল ও আগ্রহ। মাঝে মাঝে দর্শকের ব্যক্তিগত বিশেষ আনন্দের চমকপ্রদ ঘটনাও ঘটে।

একবার এক প্রৌঢ়া মহিলা এসেছেন ওপরে দেখতে তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। ছেলে জার্নালিস্ট। আমার পরিচয় পেয়ে এখানে দেখা করতেই মহিলার আসা। জানান, আমাদের সঙ্গে তাঁর বাপের বাড়ির একটা দূর সম্পর্কও আছে। তাঁর জেঠামশাই-এরও মধুপুরে কোথাও একটা বাড়ি ছিল। তিনি প্রায়ই এখানে আসতেনও। বাড়ির নাম ছিল নাকি বিন্দুবাস। জেঠামশাই মারা গেছেন বছর ষাট-সত্তর আগে। আজ এখানে আসবার পথে এই পাড়াতেই সেই বিন্দুবাস বাড়িটি দেখতে পেলেন—পোড়ো বাড়ির মত এখন ভগ্ন অবস্থা। দুঃখু হোল দেখে।

আমি চুপ করে শুনি, আর মুচকে হাসি। তাঁর কথা শেষ হলে বলি, মোহিনীবাবু আপনার জেঠামশাই হোতেন? তাঁর বাড়ির নাম বিন্দুবাস,—ঠিকই বললেন। কিন্তু আপনার দেখা ওই বিন্দুবাস নয়, এই পাড়াতেও নয়। মাঠের অপর দিকে আর এক পাড়ায়—কুসমায়। সে বাড়ি হাত-বদল হলেও এখনও বেশ ভালই আছে। চলুন, ওই ছাদ থেকে দেখতে পাবেন।

নিয়ে গিয়ে দেখিয়েও দিই। সেই দূরে—গোলাপ ফুলের মতন লাল রঙ-করা বাড়ি।

ভদ্রমহিলা উৎসাহিত হয়ে ছেলেকে বলেন, কালই চল—দেখে আসতে হবে বাড়িটা।

আমি বলি, এবার দালানে চলুন, আরও কিছু দেখবেন।

সেখানে দেওয়ালে টাঙানো একটা গ্রুপ ফটো। বোধ হয় ১৯০৮/৯ সালে তোলা। তবু এখনও পরিষ্কার ঝকঝক করছে। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ল' কলেজের কী এক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তোলা। কলেজের তখনকার সব অধ্যাপক, কর্মী ও ছাত্রদের সঙ্গে মাঝখানে বসে পিতৃদেব। মাটিতেও কয়েকজন বসে, —তার মধ্যে আমরা চারভাইও রয়েছি—অবশ্য তখন আমাদের বালক অবস্থা! আর প্রোফেসারদের মধ্যে—মহিলার জেঠামশাই! অতি সুশ্রী সুপুরুষ। গায়ে শাল জড়ানো। তিনিও তখন ওই কলেজের অধ্যাপক।

মহিলা বিপুল আগ্রহ নিয়ে দেখতে থাকেন। ছেলেকে দেখান,

—ওই দেখ আমার জেঠু—মধুপুরে এই বাড়িতে তাঁর ছবি !

আর একবারের ঘটনা। কলকাতার এক কলেজের প্রোফেসার এসেছেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। তিনিও বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা। দু জনেরই কলেজ থেকে অবসর নেওয়ার সময় হয়ে আসছে। দুজনে ঘুরে ঘুরে ছবিগুলি দেখছেন। অপর একটি গ্রুপ ফটোর সামনে এসে ভাল করে দেখেন। ১৯৩৮ সালে সেটি তোলা। ইউনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজের সামনে। ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষ্যে। মেজদা—শ্যামাপ্রসাদ তখন উপাচার্য। তিনি আছেন। পাশে বসে বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক—Sir James Jeans। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন অধ্যাপক ও সায়েন্স কংগ্রেসের কর্তৃবর্গ ও কর্মীবৃন্দ। মাটিতে বসে অন্যান্য কয়েক জনের সঙ্গে ভলানটিয়াররা। আগন্তুক মহিলা প্রোফেসারটি ফটোর বিষয়বস্তু শুনে বলে ওঠেন, ওঃ! সেই সময়কার ছবি! দেখি, দেখি। আমি তখন কলেজছাত্রী—ভলান্টিয়ারও তো হয়েছিলাম,—ও মা! এই তো এই আমি বসে—পা গুটিয়ে মাটিতে !

স্বামী প্রোফেসারটিও উৎসাহিত হয়ে দেখেন। তাঁর স্ত্রীর প্রাগ্‌বিবাহের ফটো—তরুণী কলেজ ছাত্রী !

আমি হেসে মহিলাকে বলি, এবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে সবাইকে বলতে পারবেন, মধুপুরে গিয়ে দেখি স্যার আশুতোষের বাড়িতে আমার ফটো টাঙানো রয়েছে !

॥ তিন ॥

গঙ্গাপ্রসাদ হাউস। 'বিচিত্রদৃক্‌'-এ দৃশ্যান্তর।

জন দশবারো ছাত্রী এসেছে মধুপুরে বেড়াতে। দল বেঁধে এ-বাড়ি দেখতে এল। নিচের ঘরগুলি দেখে ওপরে আসতেও আগ্রহী হয়। খবর পেয়ে নিচে নামি। তাদের সঙ্গে আলাপ করি। সবাই কলকাতায় কলেজে পড়ে। ভাবি, অতো জন ওপরে আসবে! তবুও তাদের মার্জিত ভদ্র কথাবার্তায় ও একান্ত আগ্রহ দেখে ওপরে নিয়ে চলি। বলি, দেখবার তো বিশেষ কিছু নেই। সব খালি ঘর। তবে, নিচেও যেমন দেখলে, ওপরেও সব ছবি, মানপত্র টাঙানো রয়েছে,

—দেখতে চাও, ঘুরে ঘুরে দেখ। তারা প্রশ্ন করে, আপনার বাবা—বাঙলার বাঘ—তাঁর ব্যবহার করা কোন জিনিসপত্র নেই? জানাই, তিনি চলে গেছেন প্রায় যাট বছর আগে। তাঁর ব্যবহার করা জিনিস কিছু নেই। যে ঘরে শুতেন সেই ঘর রয়েছে, সেই সব খাট, চেয়ার টেবিল ইত্যাদিও আছে। চল দেখবে।

দালানে জুতা খুলে রেখে তারা ঘরে ঢোকে। ঘুরে ঘুরে সব দেখে। এ-ঘরে ও-ঘরে ছড়িয়ে যার যা ইচ্ছা মত। মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়ে, আসুন না একবার এদিকে। এ ছবিটা কাদের? চলে যাই তাদের কাছে। ছবিটা দেখে বলি, আমরা চার ভাই ও এক বোনের।

কৌতূহলী হয়ে তারা দেখে। বলে, কতো-ও ছোট বয়সের ছবি। আপনি কোন্‌টা?

দেখাই।

"ও মা! চেনাই যায় না! আর শ্যামাপ্রসাদবাবু?"

"এই মুখ টিপে যিনি হাসছেন।"

ওধার থেকে দুজন ডাক দেয়, এখানে আসুন না একটু। এখানেও তো এটা শ্যামাপ্রসাদবাবুর ফটো। পাশে এই সাহেবটি কে?

সেদিকে যাই। বলি, এ ফটোটা ইউনিভার্সিটি কনভোকেশনের দিন তোলা। মেজদা তখন ভাইস চ্যান্সেলর, তাই গাউন গায়ে। পাশে দাঁড়িয়ে লর্ড ব্রাবর্ন, —তখনকার বাঙলার গভর্নর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর—তাঁরও সেইমত গাউন গায়ে।

একটি মেয়ে বলে ওঠে, ওমা! ওঁরই স্ত্রীর নামে বুঝি লেডি ব্রাবর্ন কলেজ? —আমি যেখানে পড়ি। আমি বলি, এ ছবিতে আর একটা বিষয় লক্ষ্য করো। মেজদা ভাইস চ্যান্সেলর রূপে গাউন পরে দাঁড়িয়ে, কিন্তু পরনে বাঙালী সাজ—কাপড়! সেই প্রথম একজন ভাইস চ্যান্সেলর কনভোকেশনে ধুতি পরে গেলেন। শুধু তাই নয়। তোমরা জান কিনা জানি না, সেই বছরই রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়ে কনভোকেশনে এলেন ভাষণ দিতে, —আর সেই প্রথম কনভোকেশনে বাঙলা ভাষায় ভাষণ! কবি তাঁর বক্তৃতায় সেই বিষয় উল্লেখও করেন!

পাশের ঘর থেকে ডাক শুনি, আপনি অনেকক্ষণ ওদের কাছেই,

—আসুন না এই ঘরে।

যেতে হয় সেই ঘরে। গিয়ে বলি, এইটেই ছিল বাবার শোবার ঘর।

মেয়েগুলি— 'তাই নাকি?' —বলে শ্রদ্ধালু দৃষ্টি ফেলে চারপাশে তাকায়।

একজন প্রশ্ন করে, ওই মস্তবড় ছবি দুটো কাদের?

বলি, দুজনের ছবি নয়, —'একজনেরই। বিভিন্ন সময়ের। আমার মায়ের ফটো। একটা প্রায় একশ' বছর আগেকার—মা-র বিয়ের কয়েক বছর পরে তোলা, —তখন আমরা ভাইবোনেরা কেউ জন্মাইনি। অপরটি—আমাদের সাত ভাইবোনের জন্মের কয়েক বছর পরে।

মেয়েরা এগিয়ে গিয়ে দুটো ছবিই ভাল করে দেখে। মায়ের অল্প বয়সের ছবিটি দেখে পরস্পরে বলে, কী অপরূপা সুন্দরী ছিলেন রে!

একজন মন্তব্য করে, দুটো ফটোতেই দেখ, সেকালের সব গয়নাগুলো কিরকম ছিল!

মেয়েরা এগিয়ে যায় সেই ঘরে টাঙানো অপর একটা ছবির দিকে।

আবার প্রশ্ন, —এটা তো দেখছি গ্রুপ ফটো। কে কে রয়েছেন এতে? কবেকার তোলা?

"এটা তোলা ১৯৪২ সালে। দার্জিলিঙ-এ। বাড়ির যাঁরা সেবার সেখানে গিয়েছিলাম, তাঁদের গ্রুপ ছবি।"

"আপনি আছেন এতে? কোন্‌টা?"

অপর একটি মেয়ে, —"না, না, দেখাবেন না। আমরা দেখে বার করি। প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার চেহারা তো?"—বলে আমার দিকে একবার তাকায়, তারপর ছবির একজনকে দেখিয়ে বলে,—এইটে!

আর একটি মেয়ে বলে, "ধ্যুত! অতো ছোট হবে কেন? এইটে। এ ধারে এই চেয়ারে বসে।"

ঠিকই দেখায় সে। তারপর সে বলে যায়, আর এই শ্যামাপ্রসাদবাবু। দেখেই চেনা যাচ্ছে। আর এই হোলেন আপনার বড়দা—রমাপ্রসাদবাবু, নয়? তাঁর পাশে ওই মহিলা—আপনার বৌদিদি নিশ্চয়?

বলি, হাঁ, বড় বৌদি।

"তাঁর পাশে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কে?"

"বৌদির বাবা।"

"ওঃ! আর পিছনে দাঁড়িয়ে কারা?"

আমি বলি, "ওই বৃদ্ধ সম্বন্ধে আর কিছু জানবার কৌতূহল হচ্ছে না?"

"কেন? আপনি তো বললেন, আপনার বৌদির বাবা, —অর্থাৎ রমাপ্রসাদবাবুর শ্বশুরমশাই!"

"তাঁর আর এক পরিচয়ও দিই। উনি বাঘাযতীনের আপন মামা। ওঁকেও জেল খাটতে হয়েছিল।"

মেয়েটি অবাক সুরে বলে, বাঘাযতীনের মামা উনি। —আচ্ছা-আ! —এবার বলুন, পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে কে কে?

আমি বলি, "দাঁড়াও —ওই বৃদ্ধের আরও এক পরিচয় বলি শোনো, —উনি সৌমিত্র চ্যাটার্জি'র ঠাকুরদা।"

মেয়ে কয়টির চোখমুখে উল্লাসের বিদ্যুৎচমক খেলে যায়, —যেন কোরাস-এ বলে ওঠে, সৌমিত্রর ঠাকুরদা! দেখি, দেখি।

তারপরই ডাক দেয় অপর ঘরে ছড়িয়ে থাকা সঙ্গিনীদের, —ওরে! শিগ্‌গির আয়— শিগ্‌গির! —সৌমিত্রর ঠাকুরদা। দেখে যা এখনি— এইখানে!

ডাকের ভাবটা এমনি, ঠাকুরদা এখনি বুঝি বা ছবি থেকে বেরিয়ে চলে যান!

অপর ঘরের সবাই-ও জমা হয় ছবির সামনে ভিড় করে। ঠেলাঠেলি করে—কাছে গিয়ে দেখার জন্যে, "সরে যা ভাই এবার একটু, আমাকে একবার ভাল করে দেখতে দে, —তুই অনেকক্ষণ দেখলি!"

আমি দূরে দাঁড়িয়ে তাদের উৎসাহ দেখি।

ভাবি, 'বিচিত্রদৃক্' খেলনাটির এও যেন এক অপরূপ রঙীন চিত্র।

॥ চার ॥

গঙ্গাপ্রসাদ হাউস। আবার আর এক দিনের ঘটনা।

তখন বড়দিনের ছুটি। ডিসেম্বর মাস। সাঁওতাল পরগনার কনকনে শীত। হুহু করে বইছে ঝড়ের মত পশ্চিমে হাওয়া। মিঠে রোদের

কোমল পরশ। বিকেল বেলা। বাগানে অনেকগুলি কণ্ঠস্বর শুনে দোতলার বারান্দায় বার হয়ে দেখি, একদল ছেলে। অনেকের গায়ে লম্বা ওভারকোট। সবারই মাথায় টুপি।

অতোজন দেখে নিচে নেমে যাই। গিয়ে দেখি, অনেকে বাগানে ঘুরছে। দুচারজন রোয়াকে উঠে বাবার মূর্তি দেখছে। আমিও বাগানে পায়চারি করি। নজর রাখি, সবাই হুড়মুড় করে বাড়ির ভেতর না চলে যায়।

একজন আমার কাছে এগিয়ে আসে। জিজ্ঞাসা করে, বাড়িটার ফটো নিতে পারি?

সম্মতি জানিয়ে জিজ্ঞাসা করি. মধুপুরে কোথায় উঠছেন সবাই? কোন কলেজের ছাত্র বোধ হয় আপনারা, দল বেঁধে আউটিং-এ এসেছেন?

ছেলেটি বলে, আমরা কলকাতার একটা ক্লাবের সভ্য সবাই, —'স্ফুলিঙ্গ'—নাম শুনেছেন হয়ত? এই ঘণ্টা দুই আগে মধুপুরে ট্রেন থেকে নেমেছি। সন্ধ্যের পর ট্রেন ধরে দেওঘর চলে যাব, —যাই, ছবিটা তুলি, —রোদ থাকতে থাকতে।

আমিও আবার পায়চারি শুরু করি।

একটি ছেলে ক্যামেরাম্যানকে ডাক দেয়, আমার ভাই! একার একটি ছবি তুলে দে। আমি বাড়ির সামনে দাঁড়াই, —বলে ধাপ বেয়ে চাতালে উঠে দাঁড়ায়।

ফটোগ্রাফার নিচে বাগানে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা ফোকাস করে।

ছবি তোলাতে উৎসুক ছেলেটির পরনে প্যান্ট, গায়ে লম্বা ওভার-কোট, মাথায় বিলাতী ধরনের ফেল্ট হ্যাট।

ফটোগ্রাফার বলে, দাঁড়া সোজা হয়ে—এবার ছবি তুলব।

ছেলেটি বলে, একটু দাঁড়া, —পোজ দিই। পেছনের ওই মূর্তিটা যেন দেখা যায়—ব্যাকগ্রাউন্ডে, —দেখা যাচ্ছে?

তারপর মাথার টুপিটা একটু ট্যারচা করে নেয়। পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরায়। ধূমায়মান সিগারেটটা ঠোঁটের নিকটে ডান-হাতের দু আঙুলে ধরে—বাঁ হাত কোমরে রেখে মুখটা অল্প উঁচু করে ডাক দেয়, —তোল্ এইবার, —দেখিস পেছনের বাস্ট-টা যেন দেখা যায়!

বাগানে দাঁড়িয়ে আমিও দেখি 'বিচিত্রদর্শক'-এর সেই অতিবিচিত্র চিত্র!

দিন যত এগুতে থাকে বাড়িতে আগন্তুক সংখ্যাও তেমনি আরও বেড়ে চলে। এর একটা কারণও দেখা যায়।

একদিন সমরবাবু—রাজহোটেলের মালিক—এলেন দেখা করতে। সদালাপী মিষ্টভাষী ভদ্রলোক। ভাল অভিনয়ও করতে পারেন, শুনেছি।

গল্প করতে করতে জিজ্ঞাসা করি, সমরবাবুর হোটেল চলছে কেমন?

তিনি বিনয় প্রকাশ করে বলেন, তা আপনাদের আশীর্বাদে ভালই। সেই পুজোর ছুটি থেকে শুরু হয়েছে, ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত সব ঘরই বুকড হয়ে রয়েছে। এখনও চিঠিপত্তর আসছে, অথচ জায়গা নেই দেবার।

আমি বলি, তা হলে হোটেল থেকে আয় হচ্ছে ভালই।

তারপর কপট গাম্ভীর্যের স্বরে জানাই, দেখুন আপনার এই আয়ের কিছু অংশ আমার প্রাপ্য। এই দাবীর কারণও জানাচ্ছি, বিচার করে দেখুন,—কতোখানি ন্যায্য। আপনার হোটেলে ট্যুরিস্টের পর ট্যুরিস্ট আসছে। দুচারদিন থেকে চলে যাচ্ছে। তারা আসে মধুপুর বেড়াতে। অনেকেই আপনার খোঁজ নেন, মধুপুরে দেখবার কী আছে? আপনারা তখন ভাবনায় পড়েন,—তাই তো! একদিন এখানে দিকে দিকে নির্জন শালবন ছিল, বনের ভেতরে কোথাও বা শিলাস্তূপ, ঝিরঝিরে বয়ে-যাওয়া ঝরণা,—বেড়াবার ঘোরবার কতো জায়গা,—আর এখন শালবন উধাও, শিলাগুলি লোপাট, ঝরণাধারাও নিশ্চিহ্ন;—শহরের বাইরে চারিদিকে খাঁ খাঁ করে শুকনা মাঠ;—মাঝে মাঝে ধানখেত! কি দেখতে যেতে বলবেন? তাড়াতাড়ি তখনি বলে দেন, দেখতে যাবেন? চলে যান গঙ্গাপ্রসাদ হাউস-এ। স্যার আশুতোষের বাড়ি। দেখে আসুন,—আর আলাপ করে আসুন উমাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে। নাম শোনেননি তাঁর! আরে মশাই, যান যান—গিয়ে অনেক গল্প শুনতে পাবেন তাঁর কাছে। —ফলে, আমার অবস্থা এখন দাঁড়িয়েছে আপনার খদ্দেরদের একজন এন্টারটেনার, আর এ-বাড়ি হয়েছে আপনার

হোটেলেরই একটা অংশ—বিনোদভবন! আপনার ব্যবসার লাভের অংশ আমার প্রাপ্য নয় কি?

প্রকৃতই হোটেলের অনেক যাত্রী এখন শুধু বাড়ি দেখতেই আসেন না, আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও গল্প করাও তাঁদের উদ্দেশ্য।

তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে মাঝেমাঝে মজার ঘটনাও ঘটে।

আলাপ করতে একদিন সকালে এক ভদ্রলোক এলেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও ছয়সাত বছরের একটি ছেলে। ছেলেটির পরনে হাফ প্যান্ট, হাত কাটা শার্ট। মাথায় ছোটবড় কালো কুচকুচে চুল, অল্প টেরিকাটা। দেখে মনে হয়, বেশ স্মার্ট ছেলেটি। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ মুখ।

দোতলায় সামনের গোল বারান্দায় চেয়ার টেবিল পাতা থাকে। তাঁদের নিয়ে সেইখানে বসি। টেবিলের একপাশে ভদ্রলোক, অপর পাশে তাঁর স্ত্রী বসেন, ছেলেটি নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মায়ের পাশে বসে।

আলাপ করে ভদ্রলোকের পরিচয় পাই, কলকাতায় সরকারী এক দপ্তরে চাকরি করেন। বেড়ানোর খুব শখ। দেশভ্রমণের নানান গল্প জমে।

ছেলেটি চুপ করে বসে শোনে। স্বভাবতই এসব কথাবার্তা বেশিক্ষণ শুনতে তার উৎসাহ থাকে না। এক সময়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দার রেলিং-এর ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। সেদিকে বাড়ির সামনে বড় বড় রাস্তা। লোকজন চলেছে। মাঝে মাঝে হয়ত একটা রিক্শা বা টঙ্গা। কখনো গরু বা ছাগল চরাতে নিয়ে চলে সাঁওতাল ছেলে। তাছাড়া, বাগানের গাছপালা, সেখানে পাখির ঝাঁক। রেলিং-এর অল্প দূরে ইলেকট্রিকের তার, - সেখানেও দুটি পাখি, —রেলিং ধরে ছেলেটি সেই সব দৃশ্যই দেখে, উৎসুক চোখে এধার ওধার তাকিয়ে।

হঠাৎ মায়ের দৃষ্টি পড়ে ছেলেটির দিকে। ডাক দেন, তুমি চেয়ার ছেড়ে ওখানে উঠে গেছ কেন? চলে এস এখানে। স্থির হয়ে চেয়ারে বস। —সেও তখনি এসে চুপ করে বসে।

আমাদের গল্পও আবার চলতে থাকে। সময়ও বহে যায়। ইতিমধ্যে ছেলেটিও আবার কখন রেলিং-এর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এইবার তার বাবা শাসন করেন, ও কী! তুমি আবার চেয়ার ছেড়ে ওখানে গেছ। ভারী ছটফটে হয়েছ। স্থির হয়ে বসে থাকতে পার না! চলে এস,

চেয়ার টেনে নিয়ে আমার পাশে বসে থাক দিকি।

ছেলেটিও তখনি মাথা হেঁট করে এসে সেইমত বসে। বুঝতে পারি, এই অকারণ ভর্ৎসনায় সে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

আমি তার পক্ষ নিয়ে বলি, কেন? ও-বেচারী তো কিছুই ছটফট করেনি। বেশ শান্ত ছেলে। আমাদের এ-সব কথাবার্তা ওর কখনো কি ভাল লাগতে পারে? তাই দাঁড়িয়ে রাস্তা, বাগান দেখছে। তারপর ছেলেটিকে উৎসাহিত করার জন্যে তার সঙ্গেই কথা বলতে শুরু করি, কোন ক্লাসে পড়ছ?

ছেলেটি উত্তর দেয়।

আমি বলি, বাঃ! তুমি তাহলে আমার চেয়ে এক ক্লাস ওপরে পড়?

ছেলেটি হেসে বলে, আপনি তো অনেক বড়!

জিজ্ঞাসা করি, তোমার নাম কি?

"অমিতাভ সেনগুপ্ত।"

তার বাবা তখনি বলে ওঠেন, ওকী! তোমার আসল নামটা বল।

আশ্চর্য হই। বলি, অমিতাভ তো বেশ ভাল নাম।

ছেলেটি মুখ নিচু করে বসে থাকে।

তার বাবা, আবার তাকে বলেন, তোমার ঠিক নামটা বল, —চুপ করে রইলে কেন?

ছেলেটি তখন অত্যন্ত সংকোচে অস্ফুটে জানায়, ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত।

ছেলের নাম ইন্দ্রাণী!

তার বাবা মা দুজনেই হেসে ওঠেন। বলেন, এটি আমাদের মেয়ে! ছেলে নয়—বুঝতে পারেননি তো? কেউই পারেন না। দেখুন না ওর কান্ড। কোনমতেই মেয়েদের জামাকাপড় পরবে না, মেয়েদের সঙ্গে মিশবে না। সব সময়ে ছেলেদের পোশাক পরবে, তাদের মত চুল কাটবে, ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করবে। নামও নিয়েছে ছেলেদের। কোন-মতেই নিজের নাম ইন্দ্রাণী মানতে চায় না।

ইন্দ্রাণী দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে মুখ গম্ভীর করে গাঁট হয়ে বসে থাকে। ভাবটা যেন, ঠিকই তো করি আমি। আমি মেয়ে হতে যাব কেন? আমি তো ছেলেই।

আমিও তাকে উৎসাহ দিয়ে বলি, ঠিক করছ তুমি। কিন্তু শোনো খুব সাবধান। বড় হয়ে এমন যেন কিছু করে ফেল না যাতে মেয়ে

বলে ধরা পড়ে যাও। সে রকম হয়েছিল একজনের—তার গল্পটা বলি শোন।

এক সময়ে আমি খুব বায়োস্কাপ দেখতাম, তোমরা এখন যার নাম বল সিনেমা। সে সময়ে একটা ফিল্ম দেখেছি, Mark of Zorro। চমৎকার ছবি। জোরো নামে একজন মস্ত যোদ্ধা বীর পুরুষ ছিলেন। দেশে কোথাও কোন অবিচারে বা অন্যায় অত্যাচারে কেউ বিপদে পড়লেই তিনি কোথা থেকে হঠাৎ এসে হাজির হোতেন,—মুখে মুখোশ, হাতে তরোয়াল। অত্যাচারীকে শাস্তি দিতেন, যে বিপদে পড়েছে তাকে উদ্ধার করতেন। জোরো তরোয়াল খেলতে পারতেন খুব ভালো, আর তাঁর শাস্তি দেওয়ার কায়দা ছিল অত্যাচারীর সঙ্গে তরোয়াল নিয়ে লড়তে লড়তে ফট করে তার হাতে, গায়ে বা কপালে তরোয়ালের ডগা দিয়ে এমনি টান দিতেন 'Z' চিহ্ন আঁকা হয়ে যেত, অত্যাচারীও তখনি তাঁকে চিনতে পেরে ভয়ে আঁৎকে উঠে "Zorro!" বলে হার স্বীকার করত। ফিল্মটা খুব চলেছিল। এরপর আর একটা নতুন ছবি এল—Daughter of Zorro! এতে নায়িকা জোরোর মেয়ে। সে—এই তোমার মতন সব সময় পুরুষ সেজে থাকে, —একেবারে সৈনিকের সাজে। তাকে দেখে কেউ বুঝতে পারে না—সে মেয়ে। তার বাপের মতনই তার দুর্জয় সাহস, তেমনি বীর যোদ্ধাও। একদিন সে তার পুরুষ সেনা অফিসারদের নিয়ে টেবিলে বসে আলোচনা করছে। তারও সৈনিক বেশ, কোমরে তরোয়াল। বীর পুরুষদের মত গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছে, —এমন সময় দেখা গেল, বক্তৃতা দিতে দিতে টেবিলের তলার দিকে আড়চোখে মাঝে মাঝে কী যেন সে দেখছে। অল্প পরেই হঠাৎ সেই গরম গরম বক্তৃতার মাঝখানে থেমে গিয়ে সেই বীরবেশী মেয়ে তড়াক করে টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠে কোমর থেকে তরোয়াল বার করে মেঝের দিকে দেখিয়ে ভয়ে কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল—Mouse! Mouse! নেঙটি ইঁদুর! নেঙটি ইঁদুর! দেখো অমিতাভ, তুমি যেন ছেলে সেজে সেই রকম কিছু করে ফেল না, —তাহলেই তুমি যে ইন্দ্রাণী তা ধরা পড়ে যাবে।

তবে, জানি ইন্দ্রাণীর সে আশংকা এখন আর নেই। সে এখন সেই বালকবেশী বালিকা অমিতাভ থেকে কিশোরী হতে চলেছে, পুরুষের সাজসজ্জা ছেড়েছে, এ-বছর কলেজে ভর্তি হবে। তার বাবা

মিঃ সেনগুপ্ত মধুপুরের সেই আলাপ পরিচয়ের জের টেনে আমার সঙ্গে এখনও যোগাযোগ রাখেন।

॥ পাঁচ ॥

মধুপুরের গঙ্গাপ্রসাদ হাউস দেখতে দিন দিন আগন্তুকের সংখ্যা বেড়ে চলে। আমিও বসে বসে দেখি, মানুষের কতো বিচিত্র চরিত্র।

মালীর বাড়ি নিকটে। যখন তখন সেখানে চলে যায়। এ-বাড়ির সদর দরজাও সব সময় বন্ধ রাখে না। খোলা দরজা দেখে আগন্তুকদের কেউ কেউ বাড়ির মধ্যেই ঢুকে একতলার ঘর দালান ঘুরে ঘুরে দেখে চলে যান। দু'একজন উৎসাহী হয়তো অন্দর মহলে ঢুকে সেই দোতলায় যাবার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দেন, বাড়িতে কেউ আছেন নাকি? —ডাক শুনে 'কে'? বলে সাড়া দিয়ে আমাকে নিচে নেমে আসতে হয়। কথা বলে, তখন লোক বুঝে, কাউকে হয়ত বলি—না, ওপরে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা আছে। আবার, কোন কোন দলকে ওপরে নিয়ে যেতেও হয়—তাঁদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও শ্রদ্ধালু মন দেখে।

কিন্তু, সব আগন্তুকদের বিচার বিবেচনা শক্তি সমান স্তরের হয় না। তারই দু একটি ঘটনা বলি।

একা স্বাবলম্বী হয়ে থাকায় আমার রান্না-খাওয়ার পাট সকাল দশটা সাড়ে দশটার মধ্যেই চুকিয়ে রাখি। করণীয় কাজকর্ম শেষ না করে, —এমন কি যাত্রা-পথ চলতেও—মাঝপথে বিশ্রাম নিতে, আমি অভ্যস্ত নই। তাতে মনে কেমন যেন অস্বস্তিবোধ থাকে। হাতের কাজ বা পথচলা শেষ করে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রামের এক অপূর্ব আনন্দ স্বাদ থাকে।

সেদিনও সকালে দশটার পরই দোতলার ভেতরের দালানে সেই টেবিলটায় খেতে বসেছি, কাঠের সিঁড়ি দিয়ে লোকজন ওঠার পায়ের শব্দ। এ আবার কারা ওপরে আসে!

ওপরে সিঁড়ির মুখে কোলাপসিবল গেট টানা রয়েছে। টেনে খুলে কজন দালানে ঢোকেন। খেতে খেতে মুখ ফিরিয়ে তাঁদের দিকে তাকাই। তাঁরাও হঠাৎ আমাকে দেখে বলে ওঠেন, ওঃ। আপনি খাচ্ছেন?

আমিও তখনি বলি, কেন? আমি তো খাই। কিন্তু আপনারা হঠাৎ এভাবে বাড়িতে ঢুকে একেবারে দোতলায় উঠে এলেন? কাউকে না বলে, বা জিজ্ঞাসা করে!

তাঁরা তখনি বলেন, নিচে কাউকে তো দেখলাম না। আর এতে হয়েছেই বা কী? অনেকেই ত আসেন এ-বাড়ি দেখতে। আপনি খাচ্ছেন, খান না,—আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছি।

আমি তখন একটু কঠিন হয়ে বলি, আপনারা এখন দয়া করে নিচে গিয়ে—যদি চান, অপেক্ষা করুন, আমি খাওয়া হলে নিচে নেমে তখন কথা বলব।

তাঁরা অবশ্য আর কথা না বলে নেমে যান। তবে, অপেক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। হয়ত ভেবে গেলেন, লোকটা কী অভদ্র।

আর একবারের ঘটনা।

তখন বড়দিনের ছুটি। বাড়িতে আমি একা নেই। ভাইপোরা, বৌমারা, নাতি, নাতনি—সবাই এসেছেন। ওপরের ঘরগুলিতেই সকলে রয়েছেন। নিচের ঘর যেমন খালি পড়ে থাকে, তেমনিই আছে। সেদিন বিকেলবেলা। আমার ঘরে ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়ছি। বৌমা এসে জানান, কারা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে আসছেন, —আপনার চেনাশুনা কেউ নিশ্চয়।

দালানে বেরিয়ে এসে দেখি, কোলাপসিবল গেটটা খোলা থাকায় একদল মেয়েপুরুষ ইতিমধ্যে ওপরে উঠে এসে দালানের এধারে ওধারে ঘুরছেন। আমার পরিচিত একজনও নেই। আমাকে দেখে কোন গ্রাহ্যই কেউ করেন না। খুশিমত ঘুরতে থাকেন, —দুজন শোবার ঘরের দিকে ঢুকতে যাচ্ছেন দেখি! আমি তখন তাঁদের নিষেধ করি, ওদিকে যাবেন না, আপনারা এভাবে বাড়িতে ঢুকে একেবারে ওপরে উঠে এলেন?

একজন এগিয়ে এসে বলেন, কেন? কী হয়েছে তাতে? আপনি কে? আমরা এ বাড়ি দেখতে এসেছি, ঘুরে ঘুরে দেখছি।

আমি বলি, আমি যেই হই। জিজ্ঞেস করে আসতে হয়। এখন বাড়িতে সবাই এসেছেন, ঘরের মধ্যে মেয়েরা রয়েছে, আপনারা দয়া করে নিচে নেমে যান।

তাঁরা আমাকে ঘিরে দাঁড়ান, বলেন, মেয়েরা রয়েছেন, থাকুন না

তাঁরা। ঘুরে ঘুরে আমরা দেখব, তাতে আপত্তি করার আবার আছে কী?

আমি কঠিন কণ্ঠেই বলি, আমাদের আপত্তি আছে, —নীচে চলে যান আপনারা।

দলের জন দুই তখন বলে ওঠে, ওরে! দেখতে দেবে না. চল চল, নেমে চল। ভারী তো দেখবার জিনিস আছে এখানে। আছে কী? খালি ঘরদোর—

আরও অনেক কিছু—এমন কি কটু কথা বলতে বলতে দুমদাম শব্দ করে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে।—আমি কোলাপসিবল গেটটা টেনে দিই, আর ভাবি, দুনিয়া প্রকৃতই এক বিচিত্র রঙ্গমঞ্চ।

তবে, এ ধরনের তিক্ত ঘটনা ক্বচিৎই ঘটেছে।

॥ ছয় ॥

বছরে যে কমাস মধুপুরে কাটাই, এইভাবে কতো বিচিত্র চরিত্রের মানুষ দেখি, ঘরে বসেই। শুধু গঙ্গাপ্রসাদ হাউস্ দেখতে-আসার দর্শকদের মধ্যেই নয়,—আমার সঙ্গেও অপরিচিত যাঁরা দেখা করতে আসেন,—তাঁদের মধ্যেও কতো বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। এবার তাঁদেরই কয়েকটি ঘটনা বলি।

সেদিন সকালবেলা। দোতলার সামনের গোল বারান্দায় পায়চারি করছি, দেখি, গেট খুলে এক ভদ্রলোক বাগানে ঢোকেন। হাতে পোর্টফোলিও ব্যাগ। ভাবি, এত সকালে কে এলেন? রেলিং ধরে দাঁড়াই। তিনি এগিয়ে আসেন। বাড়ির সামনে চাতালের ওপর উঠে দাঁড়ান। ওপরে আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

জিজ্ঞাসা করি, মধুপুরেই থাকেন? না, এখানে বেড়াতে আসা?

তিনি বলেন, আজই ভোরের ট্রেনে কলকাতা থেকে পেঁৗছেচি। এখন সোজা স্টেশন থেকে আপনার কাছে আসা। আজই আবার দুপুরের ট্রেনে কলকাতায় ফিরব আপনার সঙ্গে কাজ সেরে।

বলি, ঐ মার্বেল সীটে বসুন,—যাচ্ছি আমি।

অতো সকালে নিচের বা উপরের দরজাগুলি তখনও খোলা হয়নি।

এক এক করে দরজা খুলতে খুলতে নেমে চলি। ভাবতে থাকি. কলকাতা থেকে শুধু আমারই সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ভদ্রলোক! কী এমন তাঁর কাজ থাকতে পারে? আমি কার কীই বা সাহায্য করতে পারি। তাড়াতাড়ি বিদায় করতে হবে তাঁর কথা শুনে। আজকাল তো সর্বত্রই শুনি ধরাধরি ব্যাপার,—আর আমি তো কলকাতার সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগও রাখিনে।

নিচে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে তাঁর কাছে যাই। জিজ্ঞাসা করি, বলুন, আমার কাছে কীসের দরকার? একেবারে কলকাতা থেকে মধুপুরে চলে এলেন। ক'ঘণ্টা পরে আবার ফিরেও যাবেন!

তিনি বলেন, ভবানীপুরের বাড়িতেই গিয়েছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু আপনার দাদার কাছে শুনলাম, আপনি মধুপুরে। তাই ভাবলাম, চলে যাই ওখানেই। রাত্রের ট্রেন ধরে সকালে পেঁৗছে, দেখা করে আবার দুপুরের ট্রেনে ফিরে আসব। এলামও তাই।

আমি বলি, তাতো এলেনই দেখছি। কিন্তু কী অমন জরুরী কাজ আমার সঙ্গে?

তিনি বলেন, আমি যেতে চাই কেদার বদরী—তারই সব খবর জানতে আসা আপনার কাছে।

আমি হেসে ফেলি। মনের যতো ভাবনা উবে যায়। বলি, তা এখানে না এসে সোজা কেদার বদরী চলে গেলেই তো কতো সহজ হোত।

ওদিকে কিন্তু আলিবাবার 'চিচিং ফাঁক্'-এর মতন কেদার বদরীর নাম শুনেই আমার হৃদয় দুয়ার গেছে খুলে!

আহা বেচারী! কতো কষ্ট করে চলে এসেছেন মধুপুরে—শুধু ঐ হিমালয় পথের খবর জানতে! মনে অনুভব করি, এ যেন আমার আপন জন!

সাদরে বলি, আসুন। চলুন ওপরে। যাবেন কেদারবদরী—আজকাল ও-পথের আবার জানবার কী আছে? দেখুন দিকি, অযথা কষ্ট করে এখানে চলে এলেন আমার কাছে। আমি তো এখানে থাকি একা, নিজের যেটুকু সামান্য প্রয়োজন, তা ছাড়া কিছু রাখার দরকার হয় না। এই দেখুন না, এলেন কলকাতা থেকে আমার কাছে, আপনাকে ওপরে নিয়েও চলেছি, এক কাপ চা করেও খাওয়াতে পারব না,—দুধ নেই। তবে

একটু পরে মালী আসবে দুধ নিয়ে তখন চা কফি যা চান্‌ খাওয়াব।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে তিনি বলেন, না, না—আপনি মোটেই ব্যস্ত হবেন না। স্টেশন থেকে আসার পথে চা, জলখাবার খেয়ে এসেছি। আপনার কাছ থেকে ঐ পথের কয়েকটা খবর জেনে নিয়েই ফিরে যাব, দুপুরে কলকাতার ট্রেন,—খাওয়াদাওয়াও স্টেশনে বা বাজারে করে নেব।

বলি, চলুন তো ওপরে তারপর দেখা যাবে। অবাক কাণ্ড মশাই! যাবেন কেদার বদরী, তাই চলে এলেন মধুপুরে খবর জানতে!

দোতলার লম্বা দালানে সেই প্রকাণ্ড খাবার টেবিল। সেইখানে তাঁকে চেয়ারে বসতে বলি। জিজ্ঞাসা করি, আপনি করেন কী?

তখন তাঁর পরিচয়ও পাই। কলকাতায় এক বড় কলেজের অধ্যাপক। ছুটিছাটা থাকলেই ঘুরতে বার হন। পিতৃপরিচয়ও দেন। বলেন, তিনি ব্যারিস্টার ছিলেন, তাই তাঁকে জানতেনও হয়ত!

নাম শুনে উৎফুল্ল হয়ে বলি, আপনি মিঃ মিত্রর ছেলে! ল'কলেজে আমি যে তাঁর ছাত্র ছিলাম। শুধু তাই নয়। পরে আমিও যখন ল'কলেজে অধ্যাপনা করি, তিনি তখনও সেখানে অধ্যাপক, তাই তাঁকে সহকর্মীভাবে পাওয়ার সৌভাগ্যও হয়েছিল। তাঁর কাছে কত স্নেহ পেয়েছি। আপনি আমার মাস্টারমশাই-এর ছেলে! কী আশ্চর্য! এখন বুঝতে পারছি, আমাদের দুজনেরই অজান্তে এই কারণেই আমাদের এমন যোগাযোগ!

এইভাবেই আমাদের অপরিচয়ের আবরণ সম্পূর্ণ অপসৃত হয়।

মালী ইতিমধ্যে দুধ নিয়ে আসে। কফি তৈরি করি। বলি, তুমি তোমার প্রশ্ন যা আছে, জিজ্ঞাসা করো, আমি এই স্টোভের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে উত্তর দিয়ে যাব। তোমার ট্রেন তো সেই দুপুর এগারটার পর। আমার রান্না দশটার আগে হয়ে যায়। তুমি এইখানে স্নান করে আমি যা রাঁধি আজ না হয় তাই খেয়ে ট্রেন ধরতে যাবে।

সে আপত্তি জানায়। বলে, না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না, কষ্টও করবেন না। আমি তো বলেছি, স্টেশনেই খেয়ে নেব!

আমি ছাড়ি না। আয়োজনও সেইমতই হয়।

প্রোফেসার লোক। পোর্টফোলিও ব্যাগ খুলে কাগজ পেন্‌সিল বার করে। তার প্রশ্ন, আমার উত্তর সব লিখে নিতে থাকে। এধারে স্টোভে

আমার রান্নাও হতে থাকে।

সেদিন আমার দৈনন্দিন রুটিন মত কাজ হয় না বটে, কিন্তু সে যখন তার যা কিছু জানার জেনে, স্নানাহার সেরে, বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে, স্টেশন অভিমুখে যাত্রা করে, তখন মনে হয়, যেন মধুপুরে বসেই হিমালয়পথের পথিক জীবনের সেই অপার্থিব স্বাদ উপভোগ করলাম। যেন, কোন চটীতে বিশ্রাম নিচ্ছি, হঠাৎ এক বন্ধুও ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির.—কিছুক্ষণ প্রাণ খুলে গল্প করে, একই সঙ্গে খাওয়াদাওয়া খেয়ে, যে-যার আপন পথে রওনা হওয়া!

॥ সাত ॥

দিন যায়। বছরও ঘোরে। গঙ্গাপ্রসাদ হাউস্-এ বসে যেন 'বিচিত্রদৃক্'-এর কাঁচের পর্দায় নতুন নতুন রঙীন ছবিও দেখি।

সেবছর বড়দিনের ছুটিতে বাড়ির আর কেউ আসেননি। একাই রয়েছি।

সুবোধের বাড়ি নিকটেই। ছুটিতে এসেছে। দেখা করতে এল।

দোতলায় ভেতরের দালানে খাবার টেবিলের চেয়ারে বসে দুজনে গল্প করি।

বাইরে সন্ধ্যা নামে। বিজলি-বাতির 'লোড্শেডিং'। লণ্ঠন জ্বালাই।

হঠাৎ নিচে উঠানে টর্চ-এর আলো। একটু পরে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পায়ের শব্দ।

আশ্চর্য হই। সুবোধও মুখ ঘুরিয়ে সিঁড়ির দিকে তাকায়। দুজনেরই মনে প্রশ্ন,—কে আস্ছে এই সন্ধ্যাবেলায়?

উঠে গিয়ে সিঁড়ির মুখে, টেনে-বন্ধ-রাখা কোলাপ্সিব্ল গেটের সামনে দাঁড়াই। অপর দিকে আবছা অন্ধকারে এক ছায়ামূর্তি উঠে এসে দাঁড়ান।

জিজ্ঞাসা করি, কে?

"এসেছি উমাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে দেখা করতে।"

গেট্টা টেনে খুলতে খুলতে বলি, "এই অন্ধকারে, —এমন সময়ে? মধুপুরে কোথায় এসে উঠেছেন?"

দালানে উঠে এসে তিনি বলেন, ট্রেন থেকে নেমে স্টেশন থেকেই এই তো সোজা এখানে আসছি—আপনার কাছে।

ততক্ষণে চোখে পড়েছে, আগন্তুক শুধু অপরিচিতই নয়,—এক সাধু! গেরুয়াধরণের বেশভূষা। কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা ব্যাগ।

বলি বসুন চেয়ারে। মধুপুরে জানাশোনা কেউ আছেন যাঁর কাছে উঠবেন?

তিনি নির্দ্বিধায় বলেন, আপনার কাছেই তো আমি এসেছি।

চিন্তিত হয়ে জানাই, এখানে আমার কাছে! কিন্তু, আমি তো থাকি সম্পূর্ণ একা। নিজেই যা হোক্ রেঁধে খাই। এই যে আপনি চলে এলেন এ-সময়ে, রাত্রে আপনাকে খেতে দেবার মত কিছুই ঘরে নেই। তাছাড়া, নিচের ঘর সব খালি থাকলেও মালী সব বন্ধ করে তার বাড়ি গেছে বিছানাপত্রও মাচায় তোলা। মালী সেই রাত্তিরে কখন আবার আসবে ঠিক নেই। এখানে আপনার থাকার অসুবিধা রয়েছে। হঠাৎ এভাবে আমার কাছে এলেন কী কারণে?—আর এই অসময়ে।

কথা শুনে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন্ না। নিশ্চিন্ত ভাবেই জানান ও-সবের জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না। সঙ্গে আমার ফল রয়েছে! একটু দুধ যদি পাই, ভাল। না হলেও, চলে যাবে। আর থাকা? ঐ তো দালানের ওদিকে একটা চৌকি দেখছি—তাতেই শুয়ে পড়ব।

আমি বলি তা তো পড়বেন। কিন্তু এখন ডিসেম্বর মাস—এখানে বেশ শীত—লেপ কম্বল দরকার যে!

তিনি মৃদু হেসে বলেন, লেপ কম্বলেরও দরকার হবে না। আমি থাকি হিমালয়ে। সঙ্গে এই যে গরম চাদরটা, তাইতেই এখানকার ঠাণ্ডায় আমার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে—এটা যথেষ্ট গরম।

হিমালয় শুনে আমারও এতক্ষণে কৌতূহল জাগে। জিজ্ঞাসা করি, হিমালয়ের কোথায় থাকেন?

"কেদারনাথে,—ভৈরব মন্দিরের কাছে—গুম্ফায়। জানি, ও-অঞ্চলে আপনি প্রায়ই যান্, গতবছরও গিয়েছিলেন, তবে সেখানে আমাদের দেখা হয়নি।''

আমি বলি, না, গত বছর ভৈরব পাহাড়ে উঠিনি, সঙ্গীরা কেউ কেউ গিয়েছিলেন। কতো বছর আপনি ওখানে আছেন?

"তা, বছর তিনেক হয়ে গেল। অবশ্য শীতকালে নেমে আসি।"

সুবোধ চুপ করে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। ইতিহাসের অধ্যাপক। আদিবাস পূর্ববঙ্গে। তাই বোধহয় কৌতূহলী হয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে, আচ্ছা, স্বামিজি, কিছু মনে করবেন না, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি ঢাকা অঞ্চলের, নয় কী ?

সাধু অমনি দৃঢ়স্বরে উত্তর দেন, পূর্বাশ্রমের কথা সাধুদের জিজ্ঞাসা করতে নেই।

সুবোধও তখনি লজ্জাভাব দেখিয়ে নিজের ত্রুটি স্বীকার করে বলে, আমি গৃহী মানুষ, সাধুদের সঙ্গে আচার-আচরণে অভ্যস্ত নই—ক্ষমা করবেন।

ইতিমধ্যে এঁর এখানে থাকা বিষয়ে মনে মনে আমাকে একটা সিন্ধান্ত নিতে হয়েছে। এই সন্ধ্যেবেলায় অপরিচিত জায়গায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে আশ্রয়প্রার্থী,—তার ওপর হিমালয়বাসী সাধু—অন্তত এ রাত্রিটা যেমন করে হোক্ তাঁকে থাকতেই দিতে হয়। আতিথ্যের ত্রুটি না ঘটে তাও দেখতে হবে। হিমালয়ে সাধুদের কাছে কতো আশ্রয় ও স্নেহ পেয়েছি! তাঁকে দেখতে হবে। হিমালয়ে সাধুদের কাছে কতো আশ্রয় ও স্নেহ পেয়েছি! তাঁকে তাই জিজ্ঞাসা করি, ট্রেনে এলেন—হাত মুখ ধোবেন বোধ হয় ?

তিনি বলেন, হাঁ, জল পেলে ভাল হয়। মুখ হাত ধুয়ে একটু ধ্যানেও বসতে চাই।

"তা হলে, আসুন"—তাঁকে নিয়ে যাই দালানের প্রান্তে স্নানাগারে। লণ্ঠনটা সেখানে দিয়ে বলি,—ঐসব বালতিতে জল ভরা রয়েছে।

তিনি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেন।

আমি ফিরে আসি। সুবোধকে বলি, দেখি, এঁর বিছানাপত্রের কী ব্যবস্থা করা যায়।

সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চলুন, আমিও আপনাকে সাহায্য করি।

আমি হেসে জানাই, এই অন্ধকারে তুমি গিয়ে কী করবে ? আমার এখানে সব মুখস্ত—কোথায় কী আছে, না আছে, জানা। চোখ বুজেও বার করতে পারব। তুমি বরং আর চুপ করে বসে থেকে কি করবে ? এখন এস, বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে। কাল আবার সময় পেলে এস, তখন কথা হবে।

সে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবে। তারপর সেই বিরাট বাড়ির জনশূন্য বড় বড় ঘর দালানের দিকে তাকিয়ে কী ভাবতে ভাবতে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে দ্বিধাজড়িত চরণে নেমে যায়।

আমিও ঘরে ঢুকে একটা গালিচা, চাদর ও মাথার বালিশে ফর্সা ওয়াড় পরিয়ে নিয়ে আসি। দালানের চৌকিতে পেতে দিই।

সাধু স্নানঘর থেকে বার হন। বালিশ দেখে বলেন, উপাধানের প্রয়োজন হয় না। গালচের ওপর থেকে চাদরটাও তুলে নিন্। আমার গেরুয়া চাদরটা বিছাব।

তারপর, চৌকিতে উঠে একটা আসন পেতে স্থির হয়ে ধ্যানে বসেন।

বালিশের ওয়াড় ও চাদর ফেরত পেয়ে আমি কিন্তু মনে মনে খুশী হই। ভাবি যাক্, সাধু চলে গেলে আমাকেই আবার ব্যবহৃত জিনিস-গুলি কেচে তুলে রাখতে হোত! এখন এ-বয়সে এ-সব করতে ক্লান্তি বোধ হয়। সেই কারণেই হয়ত, সাধুর কৃচ্ছ্রসাধনার এই প্রমাণ পেয়ে তাঁর প্রতিও মন প্রসন্ন হয়।

এই অবসরে নিজের কাজকর্মও সেরে নিই।

ঘণ্টাখানেক পর। সাধুর ধ্যান ভাঙে। চৌকি ছেড়ে নামেন। দুজনে খাবার টেবিলের চেয়ারে বসি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, রাত্রের আহার আপনাকে কি দেওয়া যায়, ভাবছি। দেবার মত কিছুই দেখছি না। দুধের কথা বলছিলেন,—এক কাপ দুধ হয়ত হয়ে যাবে, আর কয়টা মিষ্টি রয়েছে, যদি খেতে আপত্তি না থাকে তাও দেওয়া যেতে পারে। মিষ্টিগুলি পরশু একজন দেখা করতে এসেছিলেন, দিয়ে গেছেন।

সাধু এ-সব নিতে রাজি হন্। কাঁচের পাত্রে দিলে তাঁর আপত্তি নেই, সে-কথাও জেনে নিশ্চিন্ত হই।

ভোরে চা খাবেন কি না জিজ্ঞাসা করি। বলেন, না, তার প্রয়োজন হয় না। তবে, সকালে ঐ নাইবার ঘরে যদি স্নান করে নিই, আপত্তি আছে?

বলি, মোটেই না। কিন্তু বাসী জলে এই শীতের সময় ওখানে চান করবেন কেন? সকাল ছ'টার পরই মালী এসে যায়, কুয়োতলায় গিয়ে চান করলে আরাম পাবেন—পাতকুয়ার জল তখন গরম থাকে।

যেমন আপনার সুবিধে মনে হয়—এখানে বা সেখানে—নিজের খুশিমত করতে পারেন।

এইবার এতক্ষণে সুস্থির হয়ে বসে সাধুর সঙ্গে পরিচয় করার সুযোগ পাই। মনে কৌতূহল, সাধুটি কে?

আমার সঙ্গে এভাবে হঠাৎ এই মধুপুরে দেখা করতে আসার কারণই বা কী?

মানুষের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা আমার স্বভাব। তাতে অযথা বাক্য ব্যয় হয় না, তাড়াতাড়ি কাজও সারা হয়। তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি হঠাৎ এভাবে আমার কাছে চলে এলেন, আগে কখনও কোনরকম পরিচয়েরও সুযোগ হয়নি—কী উদ্দেশ্যে এসেছেন বলুন দিকি। এখন কোথা থেকে আসছেন?

তিনি জানান, উদ্দেশ্য অন্য কিছুই নয়, শুধু আপনার সঙ্গে আলাপ করা। হঠাৎ এভাবে চলে আসা কীভাবে ঘটল তাও বলি। শীতের সময় হিমালয় থেকে নেমে গিয়েছিলাম—কলকাতায়। সেখানে আমার গুরুদেবের আশ্রম। কেদারনাথেই আপনার কথা লোকমুখে প্রথম শুনি। এবার কলকাতাতেও আবার দুচারজনের কাছে আপনার কথা শুনতে পেলাম। তাই ভাবলাম, আপনার সঙ্গে আলাপ করলে ত হয়। খোঁজ নিয়ে ভবানীপুরে আপনাদের বাড়িতে চলে গেলাম। সেখানে দেখা হল আপনার দাদা ও ভাইপোর সঙ্গে। শুনলাম, আপনি এখন মধুপুরে। তাই দেখা না পেয়ে ফিরে গেলাম। ভাবলাম, আলাপের ইচ্ছা ছিল, হোল না, কী আর করা যাবে। তারপর আজ আমি ট্রেনে ফিরে চলেছি দিল্লীর দিকে—তুফান এক্সপ্রেসে। এখানে নামবার কথা ভাবিও নি, কিন্তু, হোল কি, ট্রেনটা পথে ঘণ্টা দেড়েক লেট্ করলে—সন্ধ্যার মুখে একটা স্টেশনে দাঁড়িয়েছে,—হঠাৎ জানতে পারি, এটা মধুপুর স্টেশন। মধুপুর! আপনি তো এখানেই রয়েছেন। তখনি ঝোলা নিয়ে নেমে পড়লাম—তারপর খোঁজ করতে করতে আপনার কাছে এসে হাজির হয়েছি।

আমি হেসে বলি, আমি কিন্তু এমন একটা মানুষ নয়, যার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে এতো কষ্ট করলেন,—আর আমার এখানে আত্মনির্ভর হয়ে একাকী থাকা,—দেখুন তো আপনার কতো অসুবিধে হচ্ছে। কথাগুলি বলছি আর মনের কোণে আমার অসীম ঔৎসুক্য জাগে,—

হিমালয়বাসী সাধু, তাঁর গুরুর আশ্রম কলকাতায়। কোন্ আশ্রম ?

প্রশ্ন করি, আপনার গুরুদেব এখন কলকাতায় রয়েছেন ? কোথায় তাঁর আশ্রম ?

সাধু জানান, কলকাতার অমুক অঞ্চলে। আমার গুরুদেবের নাম—

নামটুকু উল্লেখ করেই তিনি থেমে যান্! আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, তাঁর সম্বন্ধে আপনার নিজের কী ধারণা ?

নামটি আমার পরিচিত। লোকমুখে শোনা, পত্রপত্রিকাতেও পড়া। সেই সম্প্রদায় সম্পর্কে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা খবরের কাগজে প্রচারিত হতে দেখেছি। শোনা যায়, তাঁদের সাধনপ্রণালীর ক্রিয়াকর্মের একটা প্রধান উপকরণ নাকি নরকপাল—মড়ার খুলি!—তখন নজরও করি, সাধুটির ঠিক গেরুয়া বসন নয়,—রক্তবর্ণ ধরণের।

সম্প্রদায়ের নাম শুনে মনে একটু চমক পেলেও তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বেশ সহজ কণ্ঠেই জানাই, দেখুন, যাঁকে কখনো দেখিনি, যাঁর সঙ্গে পরিচয়েরও কোন সুযোগ হয়নি,—তাঁর সম্বন্ধে ভালমন্দ কোন ধারণাই আমার নেই। তিনি এখন কলকাতাতেই আছেন নাকি ?

সাধু তখন তাঁর গুরুদেবের অশেষ গুণাবলীর ও নানা বিষয়ে—বিশেষতঃ বাগান করার জ্ঞান সম্পর্কে যশগান করেন। তারপর বলেন, আমি অবশ্য এখন তপস্যা ও যোগসাধনার উদ্দেশ্যে হিমালয়ে রয়েছি।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তাঁকে বলি, আপনি ক্লান্ত,—ট্রেনে এলেন। আহার করে এবার বিশ্রাম করুন। দুধটা গরম করে দিই।

তিনি উঠে গিয়ে তাঁর ব্যাগ থেকে আপেল ও কমলালেবু বার করেন। ব্যাগটা চৌকি থেকে তুলে দেখিয়ে বলেন, দেখুন কাণ্ড! কলকাতায় বাস্-এ একদিন কোন্ প্রভু এটি কীভাবে কেটেছিলেন! তারপর, সেলাই করাতে হোল!—বলে হাসেন।

আমি বলি, সন্ন্যাসীর থলির ওপরও চোরের নজর!

চায়ের কাপ্-এ গরম দুধ ঢেলে আনি। রাত্রে যদি প্রয়োজন হয়, এক গ্লাস খাবার জলও টেবিলে রেখে তাঁকে জানিয়ে রাখি। তিনি খাওয়া সেরে হাত মুখ ধুয়ে দালানের চৌকিতে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন।—আমিও প্রতিদিনের মত কোলাব্সিবল গেট তালা বন্ধ করি, আমার শোবার ঘরের দরজায় খিল দিই, শয্যাগ্রহণ করি। মনে মনে

হাসি পায়,—এই বিশাল শূন্য পুরী, অন্ধকারে আমি এখানে শুয়ে,—দোরের বাইরেই ওখানে নরমুণ্ড সন্ধানী সেই তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের এক সম্পূর্ণ অপরিচিত সন্ন্যাসী! বয়সের ধর্মে আজকাল রাত্রে দু একবার উঠে 'বাথরুমে' যেতে হয়। যেতে হলে শোবার ঘর থেকে বার হয়ে দালানে সেই চৌকির পাশ দিয়ে পথ। মাঝরাতে টর্চ হাতে একবার সেইভাবে যাইও। দেখি, সাধু আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছেন।

কিন্তু, আমার অভ্যাসমত যখন ভোর চারটায় বিছানা ছেড়ে মুখ হাত ধুতে বাইরে আসি তখন দেখা যায় সাধুজি সর্বাঙ্গে চাদর জড়িয়ে ধ্যানে বসে।

সে-ধ্যান তাঁর ভাঙে সকাল ছ'টার পর। ইতিমধ্যে আমারও সকালের নিত্যকর্মাদি সারা হয়েছে। তিনি চৌকি ছেড়ে নামতেই জিজ্ঞাসা করি, এবার স্নান করবেন তো? মালী নিচে বাগানে রয়েছে দেখছি, কুয়োতলায় গিয়ে তাজা জলে স্নান সারতে চান ত তাকে বলে দিই—জল তুলে দেবে।

তিনি বলেন, সেই ভাল, তাই করে আসি।

ব্যাগ থেকে তাঁর কাপড় ইত্যাদি বার করেন। সেই সঙ্গে একটা কাগজের বাণ্ডিলও।—কাগজগুলি আমাকে দিয়ে বলেন, এগুলি পড়ে দেখে রাখবেন,—আমি স্নান সেরে আসি।

তিনি নেমে গেলে কাগজগুলি পড়তে আমার সময় বেশি লাগে না। সাইক্লোস্টাইল করা দুতিনটে ছাপা কাগজ, কেদারনাথের পথে সাধুজির সদ্য-প্রতিষ্ঠিত এক ধর্মকেন্দ্রের Memorandum ও articles of association,—দুজন ট্রাস্টী বা অছির নাম,—দুজনই গুজরাট অঞ্চলের। তা ছাড়া খান কয়েক সাদা চিঠির কাগজ,—লেটার-হেড্-এ ছাপা সাধুজির, বোধ হয় ঐ অঞ্চলে প্রচারিত জনপ্রিয় এক নাম ও ধর্মকেন্দ্রের ঠিকানা।

এতক্ষণে সাধুর আমার কাছে আসার উদ্দেশ্যের অনেকখানি আভাস পাওয়া যায়। আমারও যা করণীয় স্থির করে ফেলি।

তিনি স্নান সেরে আসতেই কাগজগুলি তাঁকে ফেরত দিই। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে সহজ কণ্ঠে জানাই, কাগজগুলি পড়লাম। হিমালয়ের ঐ অঞ্চলে আপনি বেশ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এক ধর্মকেন্দ্র

স্হাপন করেছেন,—খুব ভাল কথা। কিন্তু, যদি এ-সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত কোনরকম সাহায্য চান,—আমার পক্ষে তা করা সম্ভব হবে না—

তিনি তখনি বলেন, না, না, আমি শুধু চাই আপনিও একজন ট্রাস্টী হন—আমার উদ্দেশ্য—

বাধা দিয়ে বলি, উদ্দেশ্য মহৎ জানি। এ-সম্পর্কে কোন আলোচনার প্রয়োজন নেই। আমি এখন যেভাবে জীবন কাটাচ্ছি, কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাই না। যতো কিছুর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, সব ছেড়ে দিয়েছি,—তারপর হাসতে হাসতে বলি, অবশ্য বহু বছর আগে দু তিনটে প্রতিষ্ঠানের আজীবন সভ্য হয়েছিলাম,—জীবন এখনও না যাওয়ায় সেগুলির সভ্যপদ এখনও রয়েছে, কিন্তু সেখানেও কোনরকম অংশগ্রহণ করি না।

তারপর একটু গম্ভীর হয়েই জানাই, ক্ষমা করবেন, এ সম্পর্কে আর কোন কথা নয়। কোন আলোচনা করেও আমার মত বদলাবে না। আমার পক্ষে এতে কোনভাবে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়।

দেখি, সাধু তবু ছাড়বার পাত্র নন, বলেন, ঠিক আছে। আপনি নিজে এতে না থাকতে পারলে, আপনার পরিচিত ভাল ভাল লোক আছেন, তাঁদের কাউকে বলে দিন—

আমি বলি, নিজে যেখানে থাকতে চাই না, অন্য কাউকেই বা সেখানে থাকতে বলব কী করে? আপনার মহৎ উদ্দেশ্য সফল হোক্—আমার শুভেচ্ছা রইল। এই পর্যন্তই। আর এ-সম্বন্ধে কোন কথা নয়। এখন বলুন, আজ আপনার খাওয়াদাওয়ার কী ব্যবস্হা করি এবং আপনার প্রোগ্রামই বা কী?

তিনি নিরাশ হয়ে বলেন, আমি আজকেই পশ্চিমে যেখানে যাচ্ছিলাম চলে যেতে চাই। ট্রেন কখন জানেন নাকি?

আমি বলি, বেলা এগারোটা নাগাদ একটা ট্রেন আছে, সেটা সাপ্তাহিক, আজকেই আছে ; না হলে, সেই বিকেলে তুফান - যে ট্রেনে কাল আপনি এসেছিলেন।

তিনি জানান, ঐ এগারোটার ট্রেনেই তা হলে যাই। এখন আবার কিছুক্ষণ ধ্যানে বসতে হবে।

আমি বলি, তা' বসুন। কিন্তু তারপর খাওয়াদাওয়া? কাল

রাত্রে তো বিশেষ কিছুই খাননি। আমি আমার রান্না করব। যদি আপত্তি না থাকে সেই সঙ্গে আপনার জন্যেও কিছু করে দিই।

তিনি তখনি জানান, না, অন্নব্যঞ্জন আমার চলবে না। ফল আমার সঙ্গে তো রয়েছেই, তাছাড়া দুধ আর কলা যদি হয়, ভালই। সাবু আছে ?

আমি বলি, সাবু তো রাখি না। দুধের ব্যবস্থা আজ করেছি। কলা ও সাবু পাওয়া যায় কিনা দেখছি। সাবু কতোখানি দরকার বলুন ত ? আমার কোন ধারণা নেই।

তিনি জানান, পোয়াখানেক হলেই চলবে।

আমি বলি, আপনি ধ্যানে বসুন। কি ব্যবস্থা হয়, দেখি।

মালীকে সকালেই বলে রেখেছিলাম, বাড়তি এক সের দুধের ব্যবস্থা করতে, সে এনেও রেখেছে। এখন সাবুর ও কলার সন্ধানে তাকে বাজারে পাঠাই।

সে গিয়ে এনে দেয়, আধ ডজন কলা ও সাবু।

পরে অবশ্য বন্ধুদের মুখে শুনি, আজকাল নাকি সাবু বলে যা বিক্রী হয় সেটা ট্যাপিওকা। যাই হোক, সাধু বসেন ধ্যানে, আর ইলেকট্রিক স্টোভে আমি চাপাই দুধ, আর ওধারে কেরোসিন স্টোভেও আমার নিজের দৈনন্দিন আহারের ব্যবস্থাও করতে থাকি।

ধীরে ধীরে সাধুজির এক সের দুধ ফুটে ঘন হতে থাকে। তখন ভাবনা হয়, সাবু কি তাইতে এখন দিয়ে ফোটাব ? কখনো তো সাবু করার সুযোগ হয়নি !

সাধুকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি ধ্যানে। উত্তর পাই না।

ভাবি, পায়স রাঁধার মত করলেই ত' হয়। সাবুটা ধুয়ে ফুটন্ত দুধে ছেড়ে দিই।

দুধ আরও ঘন হয় এবং ক্রমশঃ বেশ ঘন পায়সই হয়ে গেল দেখি। কিন্তু,—এ যে ফেঁপে এক কড়া হয়ে উঠল—যাক্। চিনি দিলেও, মনে পড়ল, সেদিন সেই মিষ্টির সঙ্গে একটা পাটালি গুড়ও তো দিয়েছিল, তার একটু দিলে নিশ্চয় বেশ গন্ধ হবে,—ভেঙে এনে একটু দিই। মধুপুরের খাঁটি দুধ, ঘন করলে সোনালি রঙ হয়ে যায়, খেজুর গুড়ের পাটালি পড়ে সেই সোনার বরণ আরও ফুটে ওঠে।

ন'টার পর সাধুর ধ্যান ভাঙে। আসন ছেড়ে চৌকি থেকে নামেন।

আমি জানাই, সাধুজি, আপনার সাবু তো দুধে দিয়ে তৈরি করলাম, ঠিক করা হোল কিনা জানি না। তিনি এগিয়ে আসেন। কড়াটার দিকে তাকান।

হিমালয়ের তুষারশিখরে প্রভাতসূর্যের রক্তাভ আভা পড়ে যেমন রঙের ছটা ফোটায়, সাবুর পরমান্নের সেই সোনার বরণও হিমালয়বাসী সাধুর মুখে চোখে তেমনি যেন খুশির ঝলক ছড়াল।

প্রফুল্ল বদনে বলেন, বাঃ! ঠিকই তো করা হয়েছে। বেশ সুগন্ধও পাওয়া যাচ্ছে!

আমিও উৎসাহ দেখিয়ে বলি, পাটালি পড়েছে যে!

তিনি বলেন, তাই নাকি? বাঃ! কিশমিশ আছে?

কিশমিশ! নাঃ, আমার কাছে তো নেই।

তিনি হাসিমুখে বলেন, "আমার কাছে আছে! আনছি"—ফিরে গিয়ে ব্যাগ থেকে একটা কাগজের মোড়ক আনেন। কিশমিশ বার করে আমাকে দেন, বলেন, ধোওয়া আছে, একেবারে দুধে ছেড়ে দিন।

সেইমত সেই সোনালি পায়সের ওপর ছড়িয়ে দিই,—ঘোর রক্তবর্ণ মুক্তার মত দেখাতে থাকে।

আমি তখন বলি চলুন, এবার টেবিলে বসবেন,—ওখানে সাজিয়ে দিই।

তিনি তাঁর আপেল ও কমলালেবু বার করেন।

একটা প্লেটে কলা, অপর প্লেটে চারটে মিষ্টি সাজিয়ে, সাবুর পায়স ভর্তি সেই স্টেনলেস স্টীলের কড়া ও হাতা টেবিলে তাঁর চেয়ারের সামনে রাখি, কড়া থেকে তুলে খাবার জন্য কাঁধা-উঁচু একটা কাঁচের বড় পাত্র ও চামচ রাখি।

তিনি সব নিয়ে বসেন। চোখ বুজে তাঁর ইষ্টদেবকে নিবেদন করেন। তারপর, আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, কই? আপনার খাওয়ার পাত্র কই? আনুন।

আমি জানাই আমার রান্না ঐ ওধারে হচ্ছে, এখন আর কিছু খাব না।

তিনি বলেন, সে কী! অ্যাতোখানি করলেন, আপনি একটুও খাবেন না,—তা কী হয়!

নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন।

অগত্যা আমি বলি, আমার এখন খাওয়ার সময় নয়,—নেহাৎ দিতে চান—আপনার ঐ চামচে একটু তুলে হাতে দিন—বলে হাত পাতি।

তিনিও এক চামচ তুলে দেন।

তারপর, চারটে কলা সেই কড়ার পায়সে চট্‌কে মাখেন ; হাতা করে ডিস-এ তুলে খেতে শুরু করেন এবং পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গেই সাজানো সব কিছুই খেয়ে শেষ করেন। তাঁর খাওয়া দেখে আমারও তৃপ্তি হয়। ভাবি, ট্রেনে দীর্ঘপথ যাবেন, হয়ত তাঁর সারাদিনেরই এই খাওয়া! তারপর, তিনি, হাত মুখ ধুয়ে নিজের বস্ত্রাদি ব্যাগে ভরেন।

এমনি সময়ে অনাথবন্ধু এসে উপস্থিত।

অনাথের সঙ্গে এর কিছুদিন আগে মধুপুরেই আমার পরিচয় হয়েছে। মধুপুরের বাসিন্দা। বছর ২৪/২৫ বয়স। ভাল গাইতে পারে, আবৃত্তি করতে পারে, অভিনয়ও করতে পারে,—সারা সাঁওতাল পরগনায় তার সুনাম আছে। কোথাও কোন অনুষ্ঠান বা জলসা হলেই তার ডাক পড়ে। এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে সে সুপরিচিত এবং প্রিয়পাত্রও।

আমি এখানে এসে একান্তে নির্জন বাস করি, অনাথ সম্পর্কে এ সব সংবাদ আমার জানা ছিল না, তার সঙ্গে পরিচয়েরও সুযোগ হয়নি। আলাপ করল একদিন সে নিজে এসে। তার কারণ, তার নানা গুণাবলীর মধ্যে আর এক চরিত্র গুণ,—তার অদম্য সাহিত্যপ্রীতি। সাহিত্যচর্চাও করে। সে কবি বলেও ও-অঞ্চলে খ্যাত। দু'একবার লিট্‌ল ম্যাগাজিনও ছেপে বার করেছে—তার সম্পাদক হয়ে। এ সব খবর অবশ্য জানতে পারি তার সঙ্গে আলাপ হবার পর। আমার কাছে সে প্রথম আসে একটা প্রবন্ধ লিখবে—তারই কিছু তথ্যের সন্ধানে। তারপর থেকেই—মধুপুরের এই প্রসিদ্ধ প্রকাণ্ড "গঙ্গাপ্রসাদ হাউস্"-এ এইভাবে একা মাসের পর মাস আমার মত এক বৃদ্ধকে কাটাতে দেখে হয়ত সে ভাবে, মধুপুরের এক তরুণ উৎসাহী বাসিন্দা হিসাবে, আমার খোঁজখবর নেওয়া তার কর্তব্য। সেই থেকে কাজের ফাঁকে সময় পেলে সে মাঝে মাঝে আসে, গল্প করে, গান শোনায়, কোন কিছুর আমার প্রয়োজন হলে এনে দেয়।

সেই অনাথবন্ধু সেদিন তখন এসে হাজির। ওপরে দালানে

উঠেই সেই রক্তাম্বর সাধুকে হঠাৎ দেখে সে চমকে ওঠে। ভাবটা যেন, এটি আবার এখানে কী করে জুটল!

আমি তার সেই ভাব অনুমান করে তখনি জানাই, স্বামিজী হিমালয়ে থাকেন, হঠাৎ কাল সন্ধ্যায় এসেছিলেন আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে, আজই চলে যাবেন। সাধু সন্ন্যাসী সম্পর্কে তরুণ অনাথের আগ্রহের অভাব, কিছু আশ্চর্যের নয়। সে শুধু "ওঃ" বলে অপ্রস্তুতভাবে বাইরের গোল বারান্দার দিকে চলে যায়।

আমিও এই সুযোগে সাধুকে জানাই, আপনি বিশ্রাম করুন। আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।

সাধুজি বলেন, বিশ্রাম আর কী করব। আমিও এবার স্টেশনের দিকে রওনা হই, ধীরে সুস্থে বেড়াতে বেড়াতে যাওয়া যাবে—ট্রেনের সময়ও তো হয়ে আসছে।

অতএব, অনাথকে বসতে বলে তাঁকে এগিয়ে দিতে তাঁর সঙ্গে নিচে নেমে যাই। ভদ্রতা করে তাঁকে বলি, দেখুন দিকি, আপনি এলেন আমার কাছে, অথচ যেভাবে এখানে থাকি, আপনাকে যত্ন করে রাখা সম্ভব হোল না, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এলেন তারও কিছুই করতে পারলাম না।

সাধুজি কিন্তু দেখি আমার প্রতি বেশ প্রসন্নই। বলেন, না, না, আমি যথেষ্ট আদর যত্ন পেয়েছি আপনার কাছে। আপনার সঙ্গে পরিচয় করে সত্যিই আনন্দ নিয়ে যাচ্ছি।

বিদায় নিয়ে বেশ হাসি মুখেই তিনি চলে যান।

দোতলায় ফিরে আসি। অনাথকে বলি, ঐ সাধুজির সম্প্রদায় কি, জান? বলে নামটা উল্লেখ করি।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত অনাথ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলে, কী বললেন? সেই দলের সাধু। ভীষণ লোক সব! চলে গেছেন? না, নিচে এখনও আছেন?

আমি হেসে বলি, কেন? তোমার দলবল নিয়ে তাঁকে তাহলে ধরবে নাকি?

সিঁড়িতে শোনা যায় পায়ের শব্দ। সুবোধ উঠে আসে।

দালানে উঠেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকায়।

জিজ্ঞাসা করি, সাধুটিকে খুঁজছ? এই একটু আগে স্টেশনে রওনা হলেন।

সুবোধ একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে বসে। গম্ভীর হয়ে বলে, যাক, গেছেন তিনি ? আমি কাল চলে গেলাম, কিন্তু আপনাকে ঐ অবস্থায় ফেলে যেতে মোটেই ভাল লাগছিল না। আপনি খুবই অবিবেচকের মতন কাজ করেছেন,—ঐ অজ্ঞাতকুলশীল লোকটিকে ঐভাবে দোতলায় থাকতে দিলেন কি ভেবে ? একা থাকেন—যদি কিছু অঘটন ঘটত,—ভাবুন তো।

আমি বলি, সব কিছু ভেবেই তাঁকে ওপরে থাকতে দিয়েছি। না দিলে অন্যায় হোত। জান না তো হিমালয়ে এই অজ্ঞাত পরিচয় আমি সাধুদের আশ্রমে কি আদরযত্ন স্নেহ পেয়েছি !—তারপর হেসে বলি, আর এই সাধুর যা চেহারা—একা তাঁকে সামলাতে এখনও আমার গায়ে শক্তি আছে। কিন্তু, সাধুটির প্রকৃত পরিচয় তো এখনও জান না। কোন্ সম্প্রদায়ের শুনবে ? —বলে গোষ্ঠীর নাম করি।

সুবোধ চমকে ওঠে। বলে, বলেন কী ! সেই দলের ! আর তাঁকে নিয়ে ওপরে রাত কাটালেন একা !

আমি বলি, অনাথও তাই বলে। কিন্তু, সাধু উনি কেমন, জানি না ; বিচারও করতে চাই না। মানুষটি ভদ্র, শিক্ষিত, কথাবার্তা আচরণও বেশ মার্জিত,—আমার তো তাঁকে মানুষ হিসাবে বেশ ভালই লাগল। তিনিও আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে গেলেন বলেই আমার ধারণা। অবশ্য সব ঘটনা এখন শুনলে তোমরা হয়ত বলবে,—অতো খাওয়ালে তুষ্ট হবেন না ? আমরাও হতাম।

॥ আট ॥

"বিচিত্রদৃক্"-এ দেখা এবার আর এক অতি অভিনব দৃশ্য।

সে ঘটনাও এক বড়দিনের ছুটিতে। সেবার সে-সময়ে গঙ্গাপ্রসাদ হাউস্ সরগরম। কলকাতা থেকে ভাইপো, বৌমা, তাঁদের ছেলেমেয়ে, জামাই—সবাই এসেছেন। ভিন্ন স্বাদের আনন্দে আমার দিন কাটে। অনেক দিন পরে নিস্তব্ধ শূন্য গৃহগুলি যেন জেগে উঠে কলধ্বনির গুঞ্জরণ তোলে।

বেলা তিনটে। নিচে বাগানে নাতি, নাতনী, নাতজামাই শীতকালের মনোরম রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি দোতলায় আমার ঘরে বসে বই

পড়ছি। জামাই হন্তদন্ত হয়ে ওপরে এসে খবর দেয়, নিচে চলুন, এক মহিলা এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে—দুই ছেলেকে নিয়ে।—তারপর একটু হেসে জানায়, তাঁরই ভাষায় বলি, আপনার "দর্শনে" এসেছেন!

আমিও হাসিতে যোগ দিয়ে বলি. দর্শনে! যাচ্ছি।

নেমে যাই নিচে।

একতলায় বাইরের গোল বারান্দায় বাবার যেখানে মূর্তি আছে তারই কাছে দেখি, দাঁড়িয়ে এক বিধবা প্রৌঢ়া মহিলা। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। সাধারণ গৃহস্থবাড়ির গিন্নিবান্নীর বেশ,—চেহারাও। পাশে দুটি ছেলে, —মনে হয়, দুজনেরই কুড়ির কোঠায় বয়স।

আমাকে দেখেই মহিলা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠেন, এই তো বাবার দর্শন পেয়েছি! বাবা, ওপরে ছিলেন, নেমে আসতে কষ্ট হয়নি!—বলেই প্রণাম করতে উদ্যত হন।

'করেন কী' 'করেন কী' বলে আমি পিছু হটে দাঁড়াই। তিনি শোনেন না। প্রণাম সারেন। তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে আমার চারদিকে পাক দিয়ে ঘুরতে শুরু করেন।

আমি বিব্রত বোধ করি। বিরক্তি প্রকাশ করে জানাই, একী করছেন আপনি!

আমার কথা তিনি কানেই দেন না, আমার চারদিকে ঘুরতেই থাকেন, আর বলেন, হিমালয় প্রদক্ষিণ করছি বাবা! হিমালয় প্রদক্ষিণ! কতোদিনের সাধ পূর্ণ করছি।

আমার ততক্ষণে নিশ্চিত ধারণা হয়েছে, মহিলার মস্তিষ্ক-বিকৃতি আছে। সামলানো যায় কী করে? পাশেই তাঁর দুই ছেলে দাঁড়িয়ে। অসহায় দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করি,—মাকে সামলাও।

দেখি, তারাও অসহায়ভাবে তাকিয়ে দেখে। ভাবি, এমন লোককে সামলানো তো সহজ ব্যাপার নয়; কিন্তু এমন মাকে নিয়ে ছেলেরা বাড়ির বারই বা হয় কেন!

মহিলা অবশেষে পরিক্রমা শেষ করে আবার একবার প্রণাম করেন। তারপর অতি স্বাভাবিক সহজ কণ্ঠে এক ছেলেকে বলেন, কই রে। তোর ব্যাগটা কই? খোল্!

ছেলেটি তার কাঁধ থেকে ঝোলান হ্যান্ডব্যাগটার মুখ খুলে মার সামনে ধরে। মহিলা তার মধ্যে থেকে একটা কাগজের বাক্সে ভরা মিষ্টি বার করে আমার হাতে দেন। আমি আপত্তি জানিয়ে বলি, কেন এ-সব অযথা কিনে এনেছেন? কোন দরকার ছিল না—

তিনি আমার কথার মাঝে বলেন, হাঁ বাবা, এটা কেনা মিষ্টিই। যা তাড়াতাড়ি হুট করে দর্শনে চলে আসা, সময় পেলাম না নিজের হাতে বেশি কিছু করতে—হাঁরে! তোর ব্যাগটা কই? ঐ মার্বেল সীট্-এ রয়েছে বুঝি? চল্-চল্, খোল্।

সেদিকপানে এগিয়ে গিয়ে সেটা খোলান। একটা টিফিন বাক্স বার করেন। ঢাকা খুলে দেখিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলেন, রাত হয়ে গেল, বাবা,—ট্রেনেরও সময় হয়ে যায়—তাড়াতাড়ি এই ক'টা মাত্র নিজের হাতে করতে পারলাম,—তা হোক্—নিজের হাতে করা মিষ্টিভোগও হিমালয়কে দেওয়া কম বেশি যেমনই হোক—ধরুন বাবা! হাত পেতে—অন্ততঃ একটা এখন মুখে দিন্!

দেখি, কয়টা সুন্দর চন্দ্রপুলি!

মহিলার আন্তরিক কথাগুলি শুনে চোখে আমার জল ভরে আসে।

অবাক হয়ে ভাবি, একেই কি বলে বিন্দুতে সিন্ধু দেখা! মাতৃচক্ষে বিশ্বরূপ!

কই! মহিলার আচরণে, কথাবার্তায় এখন তো কিছুমাত্র বিকৃতির লক্ষণ দেখি না।

বলি, বসুন সবাই এই সীট্-এ, আমিও বসছি। আপনারা কোথা থেকে আসছেন, এখন বলুন, শুনি।

মহিলা বলেন, না বাবা, আগে এই মিষ্টি একটু মুখে দিন, —তারপর অন্য কথা।

তাঁর পীড়াপীড়িতে একটু ভেঙে খেতেই হয়। ভাবি, এ-যেন অবোধ বালিকার খেলাঘরের গোপালকে ভোগ খাওয়ানো।

তাঁকে জানাই, চমৎকার তৈরি করেছেন। এবার শুনি, ট্রেনে কোত্থেকে এলেন?

তিনি এতক্ষণে সুস্থির হয়ে বসেন, তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, এলাম? থাকি ২৪ পরগনার এক গ্রামে—জয়নগরের পাশে, জয়নগরের নাম ত নিশ্চয় জানেন।

আমিও এতক্ষণে স্বাভাবিক পরিবেশে আসতে পেরে হেসে বলি, জয়নগরের নাম খুব জানা, কিন্তু দোকান থেকে ঐ মিষ্টি না কিনে সেখানকার প্রসিদ্ধ মোয়া আনলেই তো পারতেন!

তিনি বলেন, যা হট করে চলে আসা বাবা, জোগাড় করার সুযোগ পেলাম কই। কীভাবে আসা, শুনবেন? সত্যিকার ইচ্ছা থাকলে ও চেষ্টা করলে দর্শন মেলেই, খুব সত্যি কথা। সংসারের কাজকর্ম চুকলে আজন্ম আমার অভ্যেস বই পড়া। গ্রামের লাইব্রেরী থেকে ছেলেদের দিয়ে কেবলি বই আনাই আর পড়ি। আপনার বইগুলো পড়বার পর কেবলি মনে হতে থাকে, যে করে হোক, আপনাকে দর্শন করতেই হবে। হিমালয়ে যাওয়া আমার পক্ষে ত সম্ভব নয়। আপনার দর্শনলাভেই হবে আমার হিমালয় দর্শন! হাসবেন না বাবা, এ আমার প্রাণের কথা! (মহিলার দেখি, চোখ ছল্‌ছল্‌ করে) কিন্তু আপনি কোথায় থাকেন, তার খোঁজ পাই কী করে? ছেলেদের বলি, লাইব্রেরীয়ানকে গিয়ে বলিস তো একবার, ও'র বই আনতে নিশ্চয় তাঁরা তাঁর প্রকাশকদের কাছে লোক পাঠান, সে যেন জেনে আসে উমাপ্রসাদবাবুর ঠিকানা কী এবং এখন কোথায় রয়েছেন। তারপর, কালই সন্ধ্যায় খবর পেলাম,—আপনি মধুপুরে। অমনি আমার এই ছেলেদের বললাম, চল, আমাকে মধুপুরে নিয়ে। অনেক-দিনের বাসনা তাঁকে দর্শনের। আজ রাতের ট্রেনেই রওনা হব—আর দেরী করা নয়। —কিন্তু শুধু হাতে আসব? গাছের নারকেল ছিল ঘরে, তাই নিয়ে তখনি বসে গেলাম—ঐ কটা চন্দ্রপুলি করতে। ওদিকে ট্রেনের সময় এসে যায়,—মাঝরাতে সেখান থেকে রওনা হয়ে শেয়ালদায় নেমে ভোরের প্যাসেঞ্জার ধরলাম,—এখানে এসে পৌঁছুলাম —বেলা দুটো নাগাদ। তারপর স্টেশন থেকে সোজা চলে আসা এই এখানে, এসেই দর্শনও পেয়ে গেলাম, আমার হিমালয় দর্শন! —মহিলার মুখে চোখে তৃপ্তির খুশি।

আমি হেসে বলি, যে কষ্ট করে এখানে এলেন,—সোজা হরিদ্বারে চলে গিয়ে সত্যিকার হিমালয় দেখে আসা আরও সহজ হোত।

তিনি জানান, বাবা, এই দর্শনেই আমার পরিতৃপ্তি, গণেশের হরপার্বতীকে পরিক্রমা করে বিশ্বপরিক্রমা হয়েছিল,—মনে নেই?

জিজ্ঞাসা করি, দু একদিন এখানে থাকবেন তো?

তিনি জানান, না,—যে উদ্দেশ্যে আসা তা তো হয়ে গেল। কালই ফিরে যাব। তবে এখন ভাবছি, মধুপুরে যখন এসেই গেছি আরও দুটো তীর্থদর্শন করে যাই। একটা হোল—বাবা বৈদ্যনাথ। কাল সকালের ট্রেনে সেখানে গিয়ে দর্শন করে কালই সোজা ওখান থেকে ফেরবার ট্রেন ধরব। আর, অপরটির খবর জানি না, আপনি বলতে পারেন? আমার মায়ের দাদামশাই সেকালের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, সে আমলের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষও হয়েছিলেন। শুনেছি, তাঁরও বাড়ি ছিল মধুপুরে, আসতেনও এখানে প্রায়ই, সে বাড়ি ছিল কোথায় জানেন নাকি?

নাম বলতেই চিনতে পারি।

বলি, হাঁ, জানি, পাথরচাপুটিতে। বহুকালের পুরানো বাড়ি। এখনও রয়েছে। অনাথবন্ধু আসবে এখুনি, তাকে বলে দেব, সে দেখিয়ে দেবে।

তারপর তাঁদের বসতে বলে ওপরে যাই। বৌমাকে তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিই—তাঁদের হাতমুখ ধোওয়া ও খাওয়ানোর ব্যবস্হা করতে।

মহিলা তাঁর ঈপ্সিত তীর্থ-দর্শন সাঙ্গ করে তাঁর গ্রামে ফিরে তাঁর মনের অপরিসীম আনন্দ জানিয়ে আমাকে চিঠি দেন।

॥ নয় ॥

'বিচিত্রদুক'-এর এবার এক অতি আধুনিক চিত্র।

১৯৮৯ সাল। দু'বছরের ওপর মধুপুরে আসা সম্ভব হয় নি। ভাইপোরা এখন গার্জেন। এই বয়সে ঐভাবে একা একা এসে স্বাবলম্বী হয়ে কোথাও থাকি, কোনমতেই চায় না। আমার আসাও হয় না।

এক ভাইপো সঙ্গে করে নিয়ে যান্ দিল্লীতে। সেই সুযোগে তাঁর সঙ্গে দুদিনের জন্যে হরিদ্বার-হৃষীকেশ-লছমনঝোলা ঘুরে আসাও হয়। এ-যেন শুধু হিমালয়ের চরণ স্পর্শ করার তৃপ্তি।

পুজার ছুটি এসে যায়। আমাদের স্নেহের নাতিটি কলকাতা থেকে জানায়, বৌমা ও শিশুকন্যাকে নিয়ে মধুপুরে কদিন কাটিয়ে আসার তাদের খুব ইচ্ছে, আমিও যদি সঙ্গে যাই তবেই তারা যাবে।

আমাকেও নিয়ে যাওয়ার তাদের উদ্দেশ্য যাই হোক্, আমি জানি,

তাদের সঙ্গে না গেলে অসুবিধায় পড়বে। ঐ বিশাল 'গঙ্গাপ্রসাদ হাউস্'। আজকালকার দিনে মালী, কেয়ারটেকার থাকলেও নিজেদের থাকবার ঘরগুলি তালাচাবি বন্ধ করে আসতে হয়। সেইসব ঠিকঠাক খোলা, ঘরদোর পরিষ্কার করানো, জিনিসপত্র কোথায় কী তোলা আছে, বার করা, জানা না থাকলে, তাদের মুশকিল হবে। তাই, আমিও সঙ্গে থাকলে, বসে বসে নির্দেশ দিলেও তারা সহজেই সব ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। এ-যেন আলিবাবার চিচিংফাঁক্ মন্ত্রবিদ্‌কে সঙ্গে রাখা।

আর মধুপুর যাবার জন্যে আমি তো পা বাড়িয়েই থাকি।

তখনি তাদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাই। সেখানে পেঁছে সব সাজিয়ে গুছিয়ে বসতেও কোন অসুবিধে হয় না। তাদের আদর যত্নেরও কোন ত্রুটি থাকে না। কিন্তু, আমার সেই চির-ঈপ্সিত নিরিবিলি মধুপুর-বাস সম্ভব হয় না। অশান্তির কারণ ঘটিয়েছি দেখি—আমি নিজেই। নিজের পাতা জালে নিজেই জড়িয়ে পড়া!

সেই-বছরই শারদীয় "দেশ" পত্রিকায় "ক্যালাইড্যাস্কোপ্" লেখাটি বার হয়েছে। এদিকে যথারীতি পুজার ছুটিতে সাঁওতাল পরগনায় ট্যুরিস্টদের ভীড়ও জমেছে। মধুপুর সম্পর্কে লেখাটা তাদের নজরে পড়ে। আর 'গঙ্গাপ্রসাদ হাউস' দেখার সেটি যেন 'গাইড্ বুক' হয়ে দাঁড়ায়। দর্শনার্থীরা এসে আমারও খোঁজ করেন। লেখাটায় বর্ণিত ছবি ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মিলিয়ে দেখতে চান্। প্রশ্নবাণে জর্জরিত হই। অবাক হই দেখে, দু'একটি দল দেওঘর থেকেও এসে হাজির।

সেদিন বেলা পড়ে এসেছে। দোতলার বারান্দায় বসে নাতিদের সঙ্গে গল্প করছি, নীচে বাইরের চাতাল থেকে এক ভদ্রলোক ডাক দিলেন। রেলিং-এর ধারে গিয়ে দাঁড়াই। আমাকে দেখে তিনি তাঁর সঙ্গিনীকে সানন্দে বলেন, ঐ তো উনি রয়েছেন! তারপর আমাকে বলেন, চলে এলাম দেখা করতে। —আমি জানাই, যাচ্ছি আমি। —বসুন ঐ পাথরের সীটে। নীচে তখনি নেমে আসি। তাঁদের দেখে প্রথমে চিনতে পারি না। পরিচয় দিতেই চিনলাম; ওঃ! মিস্টার চ্যাটার্জি। কলকাতাতেই কিছুকাল আগে আলাপ হয়েছিল। নাত-জামাই-এর সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা আছে। তাই নাতিদেরও ডাক দিই

নেমে আসতে।

ভদ্রলোক কলকাতায় এক সরকারী মস্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বড় অফিসার। তবুও, গভীর সাহিত্যপ্রেমিক। পড়াশুনাও যথেষ্ট করেন। আমাকে দেখতে পেয়ে খুবই খুশী। বলেন, ক'দিনের মাত্র ছুটি। তাইতেই চলে গিয়েছিলাম দেওঘরে। তারপর আপনার 'ক্যালাইড্যস্-কোপ' পড়ে দু'জনে পরামর্শ করলাম, মধুপুর কখনো তো যাওয়া হয় নি—এই তো কাছেই, —কলকাতায় ফেরবার পথেই পড়বে। হয়ত উনিও এখন ওখানে, —চল বেড়িয়ে যাই। —যাক্, এসে আপনার ঠিক দেখাও পেয়ে গেলাম!

তাঁর স্ত্রী বলেন, এসেই আপনার বাবার ঐ বাস্টটা দেখছিলাম। চোখ দুটো আবার ফুটো করেছে!

এইভাবে আমাদের গল্প শুরু হয়। আরও দু'একজন স্থানীয় বন্ধুরাও এসে পড়েন। আরও আসর জমে।

ওদিকে সন্ধ্যার ছায়াও ধীরে ধীরে নেমে আসে।

এমন সময়ে দেখা যায়, গেট খুলে দুজন এগিয়ে আসেন।

সস্ত্রীক এক ভদ্রলোক। বয়স মনে হয় ত্রিশের কোঠায়। ধাপ বেয়ে চাতালে উঠতে উঠতে মাঝপথে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকান। আমি বলি, আসুন।

তিনি সেই সিঁড়ির ওপরই দাঁড়িয়ে বলেন, এলাম দেখতে—এখানে কী কী দেখবার আছে?

বলি, দেখবার—এখানে? এই বাড়ি দেখতেই পাচ্ছেন—আর বাড়ির ভেতর খালি ঘরদালান, কিছু ফার্নিচার, ছবি—এই সব আর কি!

তিনি হতাশ সুরে বলেন, এ-ই! আর অন্য কিছু নেই? কলকাতায় যেমন দেখেছি নেতাজির বাড়িতে কতো কী সাজানো আছে!

আমি জানাই, না, সে ধরনের কোন কিছু নেই, সব খালি ঘর পড়ে আছে,—আর এখন তো সন্ধ্যে হয়ে এল—ইলেক্‌ট্রিক-এরও হয়ত কখন লোড্‌শেডিং হয়ে যাবে।

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করেন, বাড়িতে লোকজন থাকে না? আপনি কে? এই বাড়িতে থাকেন,—না, আমারই মতন বাইরের লোক—বাড়ি দেখতে এসেছেন?

আমি জানাই, এসেছি এই বাড়িতেই দিন কয়েকের জন্যে। না,

বাইরের লোক নই। আগন্তুকের কথা বলার ধরন শুনে আমার মজা বোধ হয়। কিন্তু, মিস্টার চ্যাটার্জি, বোধ করি, বিব্রত হন, তাঁকে বলেন, এঁকে চিনছেন না? এঁর লেখা বই পড়েন নি? এঁর নাম— আগন্তুক তখনি তড়িৎ-স্পৃষ্টের মতন—কথার মাঝেই বলে ওঠেন, বইপত্তর আমি পড়ি না মশাই, আমি টেক্‌নিশিয়ান।

আমিও তখনি হেসে তাঁকে সমর্থন জানাই, খুব ভাল করেন মশাই, খুব ভাল করেন—বইপত্তর কখনো যেন ছোঁবেন না।—এখানে উঠেছেন কোথায়? থাকবেন কয়েকদিন?

তিনি বলেন, ঐ ওধারে ধর্মশালায়। পরশু চলে যাব। ছুটি ফুরিয়ে এল। তাহলে এখানে দেখবার কিছুই নেই! তবে—চল, চল, যাই—বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ধাপ বেয়ে নেমে চলেন।

শুনতে পাওয়া যায় স্ত্রীর ভৎর্সনা সুরে বলা,—তুমি কী গো! বুঝতে পারলে না কে? গেটে নাম দেখলে—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। শুনলে বইটই লেখে। তার কতো গল্প উপন্যাস পড়েছি তা থেকে কয়েকটা সিনেমাও হয়েছে—আমার সঙ্গেই তো গিয়ে দেখেছ—কিছুছু মনে থাকে না তোমার!—তারপর মহিলা ঘাড় ফিরিয়ে সেই বিরাট বাড়ির দিকে দৃষ্টি ফেলে মন্তব্য করেন, শুধু বই লিখে কতো প্রকাণ্ড বাড়িখানা করেছে দেখেছ?—কথাগুলি বলতে বলতে গেটের দিকে এগিয়ে চলেন। ঘনায়মান অন্ধকারে তাঁদের ছায়ামূর্তি ও কথোপকথন মিলিয়ে যায়!

মিঃ চ্যাটার্জি সহাস্যে বলেন, যাক্, ক্যালাইডাস্কোপ-এর একটা জীবন্ত ছবিও আমরা দেখে গেলাম!
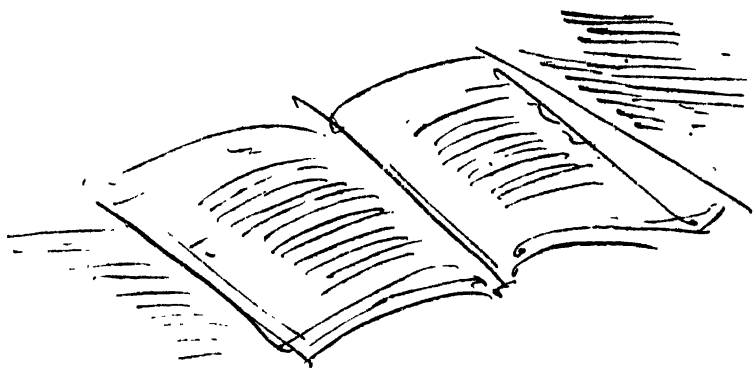
একটি জীর্ণ নোটবই ও ঘরোয়া কাহিনী

॥ এক ॥

যেমন কীটদষ্ট তেমনি জীর্ণ অবস্থা নোটবইটির। পুরানো কাগজপত্রের মধ্যে কতোকাল পড়ে রয়েছে,—কী জানি! কৌতূহলী হয়ে হাতে তুলে নিই। পকেট বই-এর মত ছোট্ট আকার। পাতাও মাত্র ষোলটি। পাতার ধারগুলি অসমান কাটা, দেখে মনে হয় বাড়িতেই কাগজ কেটে, পাতলা পিচ্‌বোর্ডের একটা মলাট লাগিয়ে পাশে রঙিন সুতো দিয়ে সেলাই করা পকেট বই। সুতো অবশ্য এখন ছিঁড়ে ঝুলছে। আর মলাটটা? গাঢ় লাল রঙ, প্রায় কালো বললেই হয়। তার ওপর পোকায় কাটা চিত্তির বিচিত্তির রেখা। ভেতরের সাদা পাতাও ধূসর, বিবর্ণ তারও গায়ে পোকায় কাটা ফুটোফুটো, যেন এককালের সুশ্রী মুখে বসন্তের দাগ।

ঝুরঝুরে ধুলোময়লা ঝেড়ে খুলে দেখি, একদিকের প্রথম পাতায় ইংরেজিতে লেখা, অমলা মুখার্জি, ৭৭ রসা রোড নর্থ, ভবানীপুর, কলকাতা। অর্থাৎ আমাদের মেজভগিনীর নাম ও বাড়ির ঠিকানা।

অমলা ছিল আমার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। জন্ম তার ১৯০৫ সালে। তার বিবাহ হয় ১৯১৬ সালে এগারো বছর বয়সে, তারপর পদবী হয়ে যায় ব্যানার্জি। নোটবই-এ নাম লেখা তাহলে ১৯১৬ সালের আগে। লেখাটাও তার হাতের নয়। মনে হয়, বড়দার।

অমলা পড়ত ডাইওসিসন্ স্কুলে—তার ছ'সাত বছর বয়স থেকে। এ-খাতা মনে হয় তারই জন্যে তৈরি করে তাকে দেওয়া! কিন্তু, ব্যবহার হয়নি। পাতা কয়টি সাদা।

কিন্তু, এ কী! নোটবইটির অপর দিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠায় বাঙলায় কবিতা-মতন! এ লেখা কার? বুড়ো মানুষের মানুষের হাতের লেখা! এ যে আমাদের ঠাকুরমার লেখা! কিন্তু চিঠিপত্র ছাড়া আর কোথাও তো তাঁর কোন লেখা কখনও দেখিনি। শিশু নাতনীর ফেলে-রাখা এ নোটবই তাহলে কি ঠাকুমার হাতে চলে যায়?

তাঁকে আমরা পেয়েছি তাঁর বৃদ্ধ বয়সে। সেই সময়ে কোন বইপত্র তাঁকে পড়তে দেওয়া যেত না,—চিঠি, তাও ক্বচিৎ, লেখা ছাড়া অন্য লেখা তো দূরের কথা। তিনি মারা যান ১৯১৪ সালে। তাঁর সম্পর্কে আমার মনে যে ছবি আঁকা আছে এবং তাঁর জীবনচরিতও যেটুকু শুনেছি বা পড়েছি, "শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যুপ্রসঙ্গ" বইখানির মুখপত্রে লিখেছি। দীর্ঘ হলেও এখানে সেটি উদ্ধৃত করি।

॥ দুই ॥

পিতামহ—গঙ্গাপ্রসাদ—ছিলেন সেকালের এক বিচক্ষণ চিকিৎসক। তাঁকে আমরা ভাইবোনেরা কেউ দেখিনি। ১৮৮৯ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। কিন্তু পিতামহী—জগৎতারিণীকে দেখবার আমাদের সৌভাগ্য হয়। তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন—১৯১৪ সালে। মধুপুরের বাড়ি তৈরি হওয়ার দু'বছর পরে। ডায়েরীতে ঠাকুমার উল্লেখ রয়েছে মধুপুরে নবনির্মিত গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান বর্ণনার মধ্যে। আমরা সবাই মধুপুরের রাস্তা দিয়ে চলেছি নূতন গৃহে প্রবেশ করতে পদব্রজে—সর্বাগ্রে চলেছেন—আমাদের পিতৃদেব নন্—পিতামহী,—সংসারের সর্বজ্যেষ্ঠা কর্ত্রী,—হেঁটে—একটা গরুর লেজ ধরে! সে-অভিনব দৃশ্য এখনও চোখের উপর ভাসছে।

ঠাকুরমা সম্পর্কে আমার আরও যেটুকু স্মৃতি আছে,—তারও কিছু ছবি এখানে দিই। তবে তার আগে তাঁর সম্বন্ধে পরোক্ষে জানা কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

গঙ্গাপ্রসাদ যখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ও বউবাজারের মলাঙ্গা লেনের এক বাসাবাড়িতে থাকেন তখনই তাঁর বিবাহ হয়। জগৎতারিণী ছিলেন উত্তর কলকাতার কাঁসারীপাড়া নিবাসী হরলাল চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। তাঁর বয়স তখন আনুমানিক বারো-তেরো বছর। সেই বাসাবাড়িতে একই সঙ্গে থাকতেন প্রসন্নকুমার বসু (১৮৪১-১৯২৯)—গঙ্গাপ্রদাসের এক সহপাঠী অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রসন্নকুমারের এক কনিষ্ঠ সহোদর মন্মথকুমারও (১৮৪৮-১৯২৪) কিছুকাল সেই বাসাতে একসঙ্গে বসবাস করেন। তিনি তাঁর "স্মৃতিকথা" পুস্তকে বর্ণনা করেছেন ঃ

"গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতা রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে এক বাসায় থাকিতেন। গঙ্গাপ্রসাদ দাদার সহপাঠী, একত্র ১৮৬১ সালে B.A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন ও তিনি Medical College-এ প্রবেশ করেন। তাঁহার মত সদাশয় নীতিপরায়ণ লোক দেশে অতি বিরল। অতি মিষ্টভাষী ও অস্বার্থপর, তাঁহাকে দেখিলেই ভক্তি হইত। ঐ সময়ে তিনি বিবাহ করিলেন ও কিছুদিন পরে তাঁহার স্ত্রীকেও ঐ বাসায় আনিলেন। শ্রীমতী জগৎতারিণী দেবী স্বামীর উপযুক্তা স্ত্রী। তাঁহাকে আমি পড়াইতাম। তিনি প্রখর বুদ্ধিমতী ছিলেন না, কিন্তু অতি সরলপ্রকৃতি, কোনরূপ কপটতা তাঁহার মনে আসিত না। হিন্দুয়ানীর কুসংস্কারগুলির উপর গঙ্গাপ্রসাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। স্ত্রীও স্বামীর সম্পূর্ণ সহধর্মিণী। তিনি গৃহস্থালি কার্য জানিতেন না। যেদিন পাচক অনুপস্থিত হইত আমরা রাঁধিতাম। কাহারও ব্যারাম হইলে তিনি মাতার ন্যায় শুশ্রূষা করিতেন। আমাদের খোস্ হইয়াছিল, তিনি প্রত্যহ সকালে গরম জল ও ছুঁচ লইয়া আসিয়া আমাদের স্ফোটকগুলি পরিষ্কার করিতে বসিতেন। আমার এক রোগ ছিল, আমি স্ত্রীলোকের স্পর্শ সহিতে পারিতাম না, এজন্য আমি নিজে পরিষ্কার করিতাম, কিন্তু অন্য ভ্রাতাদের খোস্ তিনি নিজ হস্তে পরিষ্কার করিয়া দিতেন। গরমের সময় স্কুল হইতে আসিলে একখানা পাখা হাতে উপস্থিত হইতেন ও বাতাস করিতেন। একবার আমার পানিবসন্ত হইয়া প্রায় ১৫ দিন শয্যাগত ছিলাম। তিনি সমস্ত দিবস আমার নিকটে বসিয়া গল্প করিতেন ও আমার পথ্য প্রস্তুত করিতেন। তিনি আমার সমবয়স্কা

ছিলেন বোধ হয়। তথাপি তিনি তখন যুবতী, আমি বালক। আমার সকল ভ্রাতাদের সহিত ঐরূপ মাতৃবৎ ব্যবহার করিতেন। তাহা যে কিছু অসামাজিক বা নিয়মবিরুদ্ধ এরূপ ভাব তাঁহার কখনই মনে হইত না। তাহার অনেকদিন পরে আমি যখন যুবা হইয়াছি তখনও তাঁহার গৃহে গেলে সেইরূপ বাল্যকালের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তখন আমার কেমন সঙ্কোচ হইত. কিন্তু তাঁহার হইত না।

ইহার বহুদিন পরে যখন আমাদের গৃহের মহিলাদের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল, তিনি কখনও কখনও কৃষ্ণনগরে আসিয়া দাদার গৃহে কিছুদিন প্রবাস করিতেন, আমি তাঁহার অনেক সুখ্যাতি করিতাম, তাহা শুনিয়া আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা বলিতেন তাঁহার লজ্জা-সরম নাই, সাংসারিক কোন কাজ করিতে পারেন না, তাঁহার আবার প্রশংসা কি? কিন্তু তাঁহার সরলতার জন্য সকলেই তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি করিতেন। তাঁহারা প্রশংসা করুন আর নাই করুন এই চিরবালচিত্ত মহিলারই পুত্র বাঙ্গালাদেশের সর্বাপেক্ষা প্রধান পণ্ডিত ও সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। গঙ্গাপ্রসাদ অত্যন্ত ধীর ও প্রবলচিত্তের লোক ছিলেন। কাহারও মতামত গ্রাহ্য করিতেন না। ধর্ম Religion বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা, কর্তব্যজ্ঞানে কঠোর আবার অত্যন্ত সদয় ও অস্বার্থপর।"

পরবর্তীকালে গঙ্গাপ্রসাদ যখন ডাক্তারি পেশা শুরু করেন এবং ভবানীপুরে রসা রোডে (অধুনা আশুতোষ মুখার্জি রোড-এ) নিজ বাসভবন নির্মাণ করান, সে সময়কারও কিছু কিছু বিবরণ ঐ "স্মৃতিকথা"য় পাওয়া যায়, যেমন,—"ব্যারাম হইলে আমি অথবা ভ্রাতাগণের মধ্যে কেহ তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি যথাসাধ্য যত্ন করিয়া চিকিৎসা করিতেন। আমার কনিষ্ঠ সহোদর কেশব B.L. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া রোগাক্রান্ত হইয়া ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদের গৃহে ২/৩ মাস মাতার সহিত বাস করিয়াছিল। তিনি ও তাঁহার সহধর্মিণী যথেষ্ট শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। এই দম্পতির কথা উঠিলে মনে যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হয় তাহা সমস্ত প্রকাশ করিয়া ওঠা দুঃসাধ্য।"

আবার অন্যত্র লেখা, "—গঙ্গাপ্রসাদের ভ্রাতা রাধিকাপ্রসাদের স্ত্রী শ্রীমতী ভবতারিণী দেবীও আমার নিকট কিছুদিন পড়িয়াছিলেন। .. তিনি ও শ্রীমতী জগৎতারিণী দেবী বয়স্থা হইয়া যখন সন্তানাদি

হইয়াছে তখনও এক পণ্ডিতের নিকট পড়িতেন। স্ত্রীদিগকে লেখা-পড়া শিখাইতে দুই ভ্রাতারই বিশেষ যত্ন ছিল।

ঠাকুরমাকে আমিও কখনও সাংসারিক কাজকর্ম করতে দেখি নি। তাঁর তখন বৃদ্ধাবস্থা। বৈধব্যজীবন। তৎকালীন হিন্দু বিধবার বেশ। পরনে থান কাপড়। খালি গা। পুরুষদের মতন মাথায় ছোট ছোট কাঁচাপাকা চুল—কদমফুলের মত। স্থূলাঙ্গী, বাতগ্রস্ত দেহ। থপথপে ভাব। ফর্সা রঙ। বড় বড় চোখ। প্রশস্ত উঁচু কপাল—বিরলকেশ মাথায় আরও চওড়া দেখাত। সামনের দাঁত একটু উঁচু। তাঁর মনের সরলতা যেন উথলে পড়ত তাঁর হাসিতে। হাসতেন প্রাণ খুলে—উচ্চ শব্দ তুলে। আমি ছিলাম ছেলেবেলায় রোগা লিক্‌লিকে। পাঁচ বছর বয়সে গুরুতর টাইফয়েড্‌ রোগে ভুগেছি। (এলাহাবাদ থেকে ডাক্তার অবিনাশ ব্যানার্জি,—মেজদার ডায়েরীতে তাঁর নাম উল্লেখ আছে,—এসেছিলেন চিকিৎসা করতে।) কী কারণে জানি না, আমার গলায় ছিল এক মাদুলি। ঠাকুমার কাছে প্রতিবেশিনী কয়েকজন মহিলা প্রায়ই দুপুরে আসতেন—"গুরুমশায়ের বৌ", "অমূল্যের মা", "হরেনের ঠাকুমা", স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের বাড়ির মহিলারা প্রভৃতি। তাঁরা মজলিস জমিয়ে গল্প করতেন। কখন কখন তাস খেলার আসরও বসত। বিন্তি খেলা। মেজদা এদিকে কখনও ঘেঁষতেন না, আমি কিন্তু মাঝে মাঝে যেতাম। কাছে গেলেই ঠাকুমা আমাকে খেপাতেন ছড়া কেটে,—বিজনবালা কণ্ঠমালা গলায় মাদুলি, বিজু আমাদের পাড়া-কুঁদুলী।" (বিজয়াদশমীর দিন আমার জন্ম, তাই ডাকনাম রাখা হয়—বিজু)। আমিও তখনি হাততালি দিয়ে তাঁদের আসর ঘিরে ঘিরে পাক দিতাম আর বলতাম "ঠাক্‌মাবালা কণ্ঠমালা হাতে মাদুলি, ঠাক্‌মা আমাদের পাড়া-কুঁদুলী!" (ঠাকুমারও ওপর-হাতে একটা মাদুলি ছিল);—আর ঠাকুমারও তখনি শুরু হতো হো হো করে উচ্চৈঃস্বরে হাসি।—এখনও সেই হাসির রেশ যেন কানে বাজে!

ঠাকুমার স্তনদুটি ছিল পয়স্বিনী গাভীর মতন মস্ত বড়। ঠাকুমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে বলতাম, ঠাক্‌মা তোমার বুকে যেন দুটো ঝোলা লুকিয়ে রেখেছ!—তিনি হেসে বলতেন, বটে! তোর বাবাকে কোলে শুইয়ে এই খাইয়েই অতো বড় করিয়েছি, জানিস্‌?—আমি বিশ্বাস করতাম না। বলতাম, হোতেই পারে না, বাবা বুঝি কখনো

ছোট্ট ছিলেন? তোমার কোলে উঠেছিলেন? তুমি ঠাট্টা করছ। আমি রাগ করতাম। ঠাকুমা হো-হো করে হেসে উঠতেন। বলতেন, জিজ্ঞেস করিস্ তোর বাবাকে!

স্বপ্নে দেখা ঘটনার মত অস্পষ্ট এই মধুর স্মৃতিচিত্র মানসপটে এখনও ভেসে ওঠে!

ঠাকুমার আর এক দৃশ্য, খুব মনে পড়ে। প্রায় সারা সকাল ধরে তাঁর পায়খানায় যাওয়া-আসা। সেকালে বাড়ির ভিতরে শোওয়ার ঘরের নিকটে শৌচাগার রাখার প্রথা ছিল না। ছাদের এক কোণে তৈরি হোত। ঠাকুমা দোতলায় যে ঘরে থাকতেন, সেখান থেকে ভিতরের দালানে বার হয়ে—একতলায় নামবার সিঁড়ি—তারই পাশে চাতাল পেরিয়ে ছাদ। ঠাকুমা খাটো কাপড় পরে পায়খানায় যেতেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সেই সিঁড়ির চাতালে রেলিঙ-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আবার খানিক পরে পায়খানায় যেতেন। ফিরে এসে আবার সেইভাবে রেলিঙ-এ হেলান দিয়ে দাঁড়ানো। তারপর আবার পায়খানা যাওয়া, ফিরে আসা ও দাঁড়ানো,—এই ভাবেই ঘণ্টা দেড় দুই তাঁর কাটতো। সেই রেলিঙ ধরে দাঁড়ানোর নীচে একতলায় অন্দরমহলের দালানে কোথায় কি হচ্ছে, কখন কে এল, গেল,—সেই সবই দেখতেন। এটা ছিল যেন তাঁর 'ওয়াচ্ টাওয়ার'—পর্যবেক্ষণ মিনার। কিন্তু, সারাক্ষণই যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন তা নয়। কখন কখন নীচের দালানে কাউকে ডেকে কথা বলতেন। না হলে, আপন মনে মন্ত্র-জপার মত কী যেন বিড়বিড় করতেন ও তারই মাঝে নিজের মনেই খুব হাসতেন। আমার দেখতে বেশ মজা লাগত। জিজ্ঞাসা করতাম, ঠাকুমা, আপন মনে কি বকছ? অতো হাসছ কেন?

ঠাকুমার এই এতো হাসির অন্তরালে যে তাঁর শোকদগ্ধ জীবনের গভীর ক্ষতের জ্বালা লুকান ছিল, তা শুনি অনেক পরে, বড় হয়ে, মায়ের কাছে।

ঠাকুরমার জ্যেষ্ঠ সন্তান পিতৃদেব। জন্ম ১৮৬৪ সালে বউবাজারে মলাংগা লেনের সেই বাসাবাড়িতে। দু'বছর পরে ১৮৬৬ সালে জন্ম হয় তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের। হেমন্তকুমারের। তাঁর ডাক নাম ছিল 'বকি"। কাকাবাবুকে আমরা দেখিনি। অল্পবয়সেই তাঁর মৃত্যু

হয়, ১৮৮৭ সালে। একুশ বছর বয়সে। তিনি তখন বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছেন। ফল প্রকাশিত হয় নি। মৃত্যুর পরই 'রেসাল্ট' বার হয়। তখন জানা যায়, ফিলসফি অনার্স-এ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। পিতামহ গঙ্গাপ্রসাদ মেধাবী মৃতপুত্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার চারশত টাকার গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি দান করেন। সেই "হেমন্তকুমার স্বর্ণপ্রদক" বি. এ. ফিলসফি (Mental & Moral Science) অনার্স পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকারী ছাত্রকে এখনও প্রতি বছর পারিতোষিক দেওয়া হয়। হেমন্তকুমারের হাতে-লেখা কলেজের কয়েকটি খাতাপত্র এখনও বাড়িতে রয়েছে। আর দেখেছি, ঐ রসা রোডের পুরানো পৈতৃক বাড়িতে (যেখানে আমাদের ভাই-বোনদেরও জন্ম)—তারই দুতলার একটা ছোট ঘরে—পরে আমাদের আমলে যার নামকরণ হয় 'চায়ের ঘর'—সেখানকার শার্সির একটা কাঁচের গায়ে যেন হীরে দিয়ে কাটা,—সুন্দর ইংরেজি হরফে তাঁর নিজের নাম উৎকীর্ণ করা। মায়ের কাছে শুনেছি, কাকাবাবু বাবার মতন গম্ভীর প্রকৃতির ভারিক্কি চাল-চলনের ছিলেন না। মা, পিসীমাদের কাছে নানান কৌতুকময় কথা, গল্প বলে খুব হাসাতেন। মা অবশ্য তখন নববধূ। তাঁর বিবাহের তিন বছরের মধ্যেই কাকাবাবুর মৃত্যু—টাইফয়েড রোগে, কয়দিনের অসুখেই।

পুত্রের এই অকাল মৃত্যুজনিত শোক ঠাকুরমার জীবনে নিদারুণ-রূপে আঘাত হানার এক সকরুণ কাহিনী আছে। কাকাবাবুর মৃত্যুর বছর তিনেক আগে তিনি গাজীপুরে তাঁর জেঠামহাশয়ের নিকট গিয়ে কয়েকদিন ছিলেন। কাকাবাবু মাঝে মাঝে Somnambulism—স্বপ্নচারিতায় আক্রান্ত হোতেন—সাধারণ ভাষায় যাকে বলা হয় "নিশি পাওয়া"। একরাত্রে সেখানে তিনি ঘুমের ঘোরে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান। যখন তাঁর স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে আসে তখন দেখেন, এক বনের মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সুমুখে তাঁরই দুই কাঁধে দু'হাত রেখে ঝাঁকানি দিচ্ছেন ও তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন—জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী! সেই মহাত্মা তখন তাঁকে সস্নেহে বলেন, শহর ছেড়ে এই গভীর রাত্তিরে কোথায় এই বনের মধ্যে চলে এসেছ! চল, তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। তিনি

সঙ্গে করে সেইমত দিয়েও যান। কিন্তু পৌঁছে দিয়ে চলে যাবার আগে কাকাবাবুকে জানান, দেখতে পাচ্ছি, তোমার অমুক সময়ে মৃত্যুযোগ রয়েছে, তোমার মাকে বোলো—এই নিয়মগুলি পালন করতে ও এইটি ধারণ করতে, —তাহলে তোমার ফাঁড়া কেটে যাবে। বলে কয়েকটি নির্দেশ দেন।

কাকাবাবু সে কথা ঠাকুরমাকে জানান্। কিন্তু, নিয়তির গতি, সেসময়ে এ-সব প্রকরণে তাঁদের বিশ্বাস না থাকায় নির্দেশগুলি পালিত হয় নি। সন্ন্যাসীর অবধারিত সময়ে কাকাবাবুর টাইফয়েড্ রোগে মৃত্যুও ঘটে।

সন্তানহারা জননীর বুকে এই মৃত্যুশোক যে সহস্রগুণ তীক্ষ্ণ হয়ে আজীবন বিঁধে থাকবে,—আশ্চর্য কী!

শুধু এই পুত্রশোকই নয়। কাকাবাবুর মৃত্যুর দু'বছরে মধ্যেই তাঁর বৈধব্য ঘটে,—গঙ্গাপ্রসাদ পরলোক গমন করেন। গঙ্গাপ্রসাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের ধারণা হয়, সন্তানের অকালমৃত্যুর সঙ্গোপিত গভীর শোকের আঘাতের ফলেই তাঁরও এই জীবন অবসান।

ঠাকুরমার আর এক সন্তানের জন্ম ১৮৭৪ সালে। একমাত্র কন্যা —হেমলতার। সেই কন্যারও মৃত্যু হয় ১৯০৩ সালে। উনত্রিশ বছর বয়সে।

সেই শোকতাপদগ্ধা সংসারে বীতরাগা পিতামহীকে আমার দেখা তাঁর শেষ বয়সে। যেন, বাজপড়া মহীরুহ, কোনমতে তখনও পৃথিবীর মাটির বুকে দাঁড়িয়ে, অথচ, তখন দু'একটা ডালে কোথাও সবুজ পাতা। সংসারে থেকেও সংসার-ছাড়া। আপন মনেই হাসতে থাকা আপন মনে কথা বলা।

এই জননীর প্রতি পিতৃদেবের অগাধ ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল।

সেই মাতৃভক্তির দুটি ঘটনাও "শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী" বইখানিতে তাঁরই লেখা "আমার ছেলেবেলা" অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত করি ঃ

১৯০৪ সালে তাঁকে বিচারপতির আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান এল, তখন তিনি গ্রহণ করতে উৎসুক হলেন এই কারণে যে তখনকার নিয়মানুযায়ী এই পদ থেকেই ভাইস-চ্যান্সেলার হওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হতে পারে।

আমার পিতামহী তখন জীবিতা। তাঁর আর এক পুত্র ও কন্যার তখন দেহাবসান হয়েছিল। বাবা কখনও তাঁর মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেননি। তার কিছুদিন পূর্বে তাঁকে বিলাতে সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে কলিকাতার প্রতিনিধিরূপে যাবার জন্য লর্ড কার্জন বলেছিলেন। কিন্তু আমার পিতামহীর অমত থাকায়, তখনকার দিনের এতবড় সম্মানের আহ্বান তিনি বিনা দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেন। যখন হাইকোর্টের জজ হবার জন্য চিঠি এল, বাবা তাঁর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি খুব লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু খুবই বুদ্ধিমতী ছিলেন ও বড় স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁর ছেলে চাকরি করবেন এ তাঁর ইচ্ছা হল না। বাবা তাঁকে ঠাকুরদার কথা বল্লেন ও ভাইস চ্যান্সেলার হবার সম্ভাবনা জানালেন। শেষকালে অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্বপক্ষে মত দিলেন। চিঠি লিখে বাবা তাঁর সম্মতি জানালেন। কিন্তু সেই রাত্রে আমার পিতামহী বাবাকে নিদ্রা থেকে তুলে জানালেন যে তিনি কিছুতেই মন স্থির করতে পারছেন না যে তাঁর পুত্র পরের চাকুরী করবে—তা সে যতবড় চাকুরীই হোক্ না কেন। বাবা যখন তাঁকে বুঝিয়ে বল্লেন যে তাঁর উত্তর সিমলাতে লাটসাহেবের কাছে চলে গেছে, তিনি উত্তর দিলেন যে চিঠি যেতে তিন দিন লাগবে, তার পূর্বেই টেলিগ্রাম করে জানাতে যে তিনি ওই পদ গ্রহণ করবেন না। অনেক বুঝিয়ে তখন বাবা তাঁকে শান্ত করেন। এমনি ছিল পিতৃদেবের মাতৃভক্তি।

সেই পিতামহীর প্রতি আমার মায়েরও ছিল যেমন পরম শ্রদ্ধাভক্তি তেমনি তাঁর সেবাশুশ্রূষা যত্নেরও কোন রকম ত্রুটি না হয় সেদিকেও ছিল তাঁর সদা সতর্ক দৃষ্টি। আমরা যখন ঠাকুমাকে পেয়েছি, সে-বয়সে তাঁর বাতের ব্যথা মাঝে মাঝে খুব বাড়ত। তখন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না। মালসা করে গুলের আগুন এনে সেঁক তাপ চলত। আকন্দপাতা গরম করে পায়ে বাঁধা হোত। সে-সব অবস্থায় দেখেছি, খাটের পাশে টুলে বসে মা তাঁকে খাইয়েও দিচ্ছেন।

আমরা ভাইবোনরা তো বটেই, —বাড়ীতে আরও যেসব আত্মীয়-স্বজনরা ছিলেন ও আসতেন, ঠাকুমাকে সবাই ভক্তিশ্রদ্ধা মান্য করতেন, ভালোও বাসতেন, এমনি ছিল ঠাকুমার মিষ্ট ব্যবহার। তাঁরও ছিল সবারই প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা।

॥ তিন ॥

এখন এই ছোট্ট নোট বই-এ আমাদের সেই ঠাকুমারই হাতে লেখা কবিতাকারে রচিত কয়েক ছত্র হঠাৎ আবিষ্কার করে অসীম কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে পড়তে থাকি।

লেখাটার কয়েকটি বাক্য সুস্পষ্ট পড়তে না পারলেও ও কোথাও কোথাও পোকায় কাটা ফুটা থাকলেও অনেকখানি পড়া সম্ভব, তাতে দেখা যায়, তিনি লেখেন ঃ

কে তোমাকে ভালবাসে কে তোমাকে ডাকে
যদি ডাকিতাম মনে করিতাম তোমায় ভালবাসিতাম
(ফুটা) তা হলে এ দুর্গতি কেন আমার। মাগো আর
যাতনা সহিতে পারি না—বড়ই···কষ্ট এ জীবনে ঘটল
ছোট জনের কথায় মর্ম্মভেদি আকর্ষণে প্রাণ আমার বিদরে।
রোগের জ্বালায় শোকের জ্বালায় অস্থির তাহাতে সকলের
অশ্রদ্ধা অপমান।····করা অতি দুষ্কর। কোথায় পুঁটি গেল
কোথায় পুঁটি গেল। তা হলে কি এত অপমান আমার
করিতে পারিত। ভগবান কষ্ট সহ্য করিতে পারি না।
ভগবান তুমি সকলি জান।
দিন যায় দীনতারিণী কোথা গো শিবরাণী
শিবের হৃদয়ে থাক হয়ে আদরিণী
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভকতি স্তুতি।
রেখ মা অভাগীরে দিয়ে চরণতরী। কাতরে কিংকরী ডাকে
কৃপা নীরে যে (?) ও তারে রেখ মা অন্তরে তারে করে আদরিণী
অনাথের নাথ বলে মা তোমায়, বহু কষ্ট তুমি দেও মা আমায়
আশা দিয়ে তুমি থাক মা অন্তরে
মা এসেছ মা ভবরাণী ভব হিত কারণে।
হরি তোমাকে চিনিতে পারি না। জিজ্ঞাসা করেন যুধিষ্ঠির
শুন মহামণি কহিলে রামের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী
হইল শরীর মুক্ত···(?) এজন্ম। সাবিত্রী কাহার নাম
কিবা তার····(?)····

আমাদের সেই সদাহাস্যময়ী সর্বজনপূজ্যা পিতামহীর লিখে যাওয়া এমন শোকগাথা! তাও লিখতে লিখতে হঠাৎ থেমে-পড়া!

আশ্চর্য হই। আবার পড়ি এবং তখনই তাঁর মনোবেদনার কারণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এই দুই ছত্র থেকে, —'কোথায় পুঁটি গেল কোথায় পুঁটি গেল। তাহলে কি এত অপমান আমার করিতে পারিত।'

মনে পড়ে যায়, সংসার রঙ্গমঞ্চে অতিপ্রিয়জনের মধ্যে ক্ষণিক উত্তেজনা ও রাগের বশে মান-অভিমানের এক ঘটনা।

॥ চার ॥

পুঁটি ডাকনাম ছিল ঠাকুমার একমাত্র কন্যা হেমলতার। সেই সন্তানের যখন মাত্র উনত্রিশ বছর বয়স তাঁকে ঠাকুমা হারান। এই শোকগাথা রচনার বছর দশেক আগে। আমার সেই পিসীমা—হেমলতার--বিবাহ হয় সতীশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে। পিসীমার মৃত্যুর পর তিনি আর বিবাহ করেন নি। তিনি দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন। আমাদের খুব স্নেহও করতেন। তিনি ছিলেন সে আমলের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনি নির্ভীক, সত্যপরায়ণ ও তেজস্বী। মহারাজ নন্দকুমারের দৌহিত্র-বংশধর। সেই কারণেই কিনা কী জানি, পিসে-মহাশয় ও তাঁর সন্তানরা ছিলেন খুব মেজাজী। সহজেই রাগের বশীভূত হয়ে পড়তেন। তাঁদের পরিবারে—বাবা, ছেলেমেয়ে এবং ভাইবোনদের মধ্যে কখন কখন পরস্পরে এমনি মনান্তর হোত—একজন অপরজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন না, কথাবার্তাও বন্ধ। তবে, এসব মান অভিমান দীর্ঘস্থায়ী হোত না, কিছুকাল পরেই আবার সম্পর্ক সহজ স্বাভাবিক রূপ নিত।

আমাদের পিসতুত ভাইবোনেদের সঙ্গে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল ;—পরস্পরে যেন আপন ভাইবোন। সেকালের যৌথপরিবারে এ সম্পর্ক স্বাভাবিকই। আমাদের গৃহ তো তাঁদের মামার বাড়ি, তাঁরাও সেইমত আসতেন, থাকতেন, মামার বাড়ির আদর যত্নও পেতেন!

পিসেমহাশয়ের দুই ছেলে—শ্রীশ ও বঙ্কিম—আমাদের 'কর্ত্তাদা' ও 'বেঁকাদা' তাঁদের পিতার চরিত্রের অনেক সদ্‌গুণ যেমন পান, তেমনি রাগের স্বভাবও। তবে কর্ত্তাদার তুলনায় বেঁকাদার রাগ হতে দেখেছি

ক্বচিৎই। সেই স্বাধীনচেতা দুই ভাই-ই বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ থাকার সন্দেহে পরাধীন ভারতের বৃটিশ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। দুজনকেই অন্তরীণ হয়ে থাকতে হয়। বেংকাদারই শাস্তি-ভোগ চলে কয়েক বছর ধরে। কর্ত্তিদা নিয়মিত আখড়ায় কুস্তি লড়তেন। কুস্তির পালোয়ানের মতন দেহও ছিল সবল, পেশীবহুল। ঝাঁকড়া গোঁফও রেখেছিলেন তাঁর মাতুল আমাদের পিতৃদেবের অনুরূপ! আর বেংকাদার চেহারা ছিল স্বাস্থ্যবান সাধারণ বাঙালী যুবার মত। তিনি ছিলেন স্পোর্টস্‌ম্যান। খেলাধুলোও যেমন করতেন, তেমনি রীতিমত তালিম নিয়ে চমৎকার গান গাইতেও শেখেন। তাঁকে থিয়েটার করতেও দেখেছি একবার। সে-ঘটনাও বলি।

বছর পঁচাত্তর আগেকার ঘটনা। ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্‌টিটিউটের বার্ষিক এক উৎসব। পাবলিক স্টেজে সেকালে থিয়েটার দেখতে যাওয়ার অনুমতি আমাদের ছিল না। বাবার সঙ্গে ঐ ইন্‌স্‌টিটিউট হলে থিয়েটার দেখেছি কয়েকবারই আর, ঐখানেই তখন শিশির ভাদুড়ী, নরেশ মিত্র প্রভৃতির অভিনয় দেখার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়,—তাঁরা তখন শিক্ষা-জগতের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। সেই ইন্‌স্‌টিটিউট হলে সেবার নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে, মনে আছে, ভীষ্ম। আমি তখন স্কুলে পড়ি। আমরা ভাইরা—গিয়েছি বাবার সঙ্গে দেখতে। একেবারে সামনের সারির চেয়ারে বসে রয়েছি। ছাপা প্রোগ্রাম দিয়ে গেল। কে কি পার্টে অংশ নিচ্ছেন,—নাম ছাপা। পড়ছি। হঠাৎ নজরে আসে, 'অম্বা'র চরিত্রাভিনয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রায়! তিনি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র (সেকালে মেয়েদের পার্টে ছেলেরাই মেয়ে সাজতেন।) আমি অবাক! ভাবি, বাবার সুমুখে করবেন কি করে? বাবা দেখে চিনতে পারবেন হয়ত। চিনলে কি মনে করবেন! আর, বেংকাদা তো দেখতেই পাবেন—একেবারে সামনেই বসে তাঁর মাতুল! বেংকাদা যথাসময়ে নামলেন সেইমত মেয়ে সেজে। সুন্দর অভিনয় করে গেলেন, তাঁর মামা সামনেই বসে, তার জন্যে কোন সঙ্কোচ, লজ্জা বা আড়ষ্টতার কিছুই প্রকাশ পেল না। আমি কিন্তু বাবার পানে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছি,—মুখে যেন তাঁর মৃদু হাসির রেখা!

পরের দিনই বেংকাদা আমাদের বাড়িতে এলেন। আমাদের তখন সে কী হাসাহাসি!

বে'কাদা সম্পর্কে এত কথা লেখার কারণ,—ঠাকুমার ঐ শোকগাথার ঘটনারও প্রধান নায়ক আমাদের সেই বে'কাদা !

এবার সেই ঘটনা বলি ।

॥ পাঁচ ॥

ঠাকুমার মৃত্যু হয় ১৯১৪ সালে, আর এই ঘটনা তারই কিছুকাল আগে, সম্ভবতঃ ১৯১৩ সালে ।

মৃতকন্যা 'পুটি'র ছেলে—ঠাকুমারও আদরের নাতি 'বে'কা'। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সেবার পুরী যান । সেখানে সমুদ্রের নিকট এস্ কে. লাহিড়ীর বাড়িতে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হয় ।

ঠাকুমার পক্ষে সমুদ্রে স্নান করা সম্ভব নয়, কিন্তু নাতির তখন বয়স আঠার উনিশ হবে । যৌবনসুলভ তাঁর প্রচণ্ড উৎসাহ, প্রতিদিন সমুদ্রস্নান তাঁর করা চাই-ই । অথচ, তাঁর দিদিমা তাঁকে একা ঐ উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে স্নান করতে পাঠাতে ভয় পান । প্রতিদিনই তাঁর সঙ্গে চলেন । নিজে সমুদ্রতীরে বালির ওপর বসে থাকেন, বে'কাদা স্নানে নামেন । ঘটনার দিন, স্নানের সময় সমুদ্রে তখন জোয়ার । প্রকাণ্ড বড় বড় ঢেউ । ঢেউ-এর পর ঢেউ আসে । বালির চরে এসে সগর্জনে আছড়ে পড়ে । সোঁ সোঁ রবে জলের স্রোত পিছনে চলে যাবার পথে, নিমেষে নতুন আসা আর এক প্রকাণ্ড ঢেউ-এর সংঘাতে আবার লাফাতে লাফাতে এসে বালির তটে আছড়ে পড়ে । স্রোতের টানও তেমনি প্রচণ্ড । ঠাকুমা সমুদ্রের উগ্রমূর্তি দেখে চিন্তিত হন । নাতিকে সাবধান করেন, ওরে, আজ এই কাছাকাছি জলে কোনমতে চান সেরে নে, প্রতিদিনের মত দূরে গিয়ে ঢেউ-এর মধ্যে ঝাঁপাঝাপি লাফালাফি করিস নে ।

দুর্জয় সাহসী তরুণ কী সে কথায় কান দেয় ! জলে নেমে ঢেউ-এর মধ্যে ঢোকে । কখনো লাফিয়ে, কখনো বা জলে সর্বাঙ্গ ডুব দিয়ে বড় বড় ঢেউগুলি নেয়, কখনো ঢেউ-এর সঙ্গে ভেসে তীরে এসে পড়ে ।

ঠাকুমার এসব দেখে ভয় জাগে। বার বার নিষেধ করেন, জল ছেড়ে চলে আসতে বলেন। ওদিকে নির্ভীক তরুণ নাতি তখন এই জলখেলায় উন্মত্ত। দিদিমার নিষেধ শোনেন না। উৎসাহ তাঁর আরও বাড়ে। বাহাদুরী দেখিয়ে দিদিমাকে আরও উত্তেজিত করে তোলেন, বৃদ্ধা দিদিমাকে ভয় দেখিয়ে বলেন, এবার দেখ, আরও দূরে চললাম—ঐ ঐ ওদিকের আরও বড় বড় ঢেউ-এর মধ্যে।

অবশেষে, তাঁর দিদিমা রেগে যান, নাতি আবার নিকটে আসতেই তাঁর অবাধ্যতার জন্য ধমক দেন, কী সব বলে গালি পাড়তে থাকেন।

বেঁকাদারও মেজাজ বিগড়ায়, প্রচণ্ড রাগ হয়, যা তা ভাষা প্রয়োগ করে দিদিমাকে অপমান করেন। রাগের মাথায় তখন নাকি বলেই ফেলেন, আমাকে এমন গালাগাল! বুড়ি, তুই বেঁচে থাকতে মামার বাড়িতে ঢুকব না!

এরই পর, মনে হয়, ঘরে ফিরেই, পুরীতে বসেই, সদ্যলাঞ্ছিত আমাদের ঠাকুমার গভীর মনোব্যথায় লেখা ঐ কয় ছত্র শোকগাথা, এবং লিখতে লিখতে ভগবদ্ভক্তিতে শোকাবেগ ভুলে যাওয়া,—লেখাও অসমাপ্ত।

॥ ছয় ॥

এর পরেই তাঁরা কলকাতায় ফিরে আসেন। বেঁকাদাকেও আর মামার বাড়িতে কিছুকাল দেখা যায় না। আবার বেঁকাদা এলেন কবে, সেই দিনের মর্মান্তিক ঘটনা এখনও যা মনে পড়ে শোনাই।

১৯১৪ সাল। আমার তখন বারো বছর বয়স। ছুটির দিন। দুপুরে বেলা। বাড়ির দোতলার বাইরের ঘরে রয়েছি। বাবা সেদিন বাড়িতে নেই। কলকাতার বাইরে গেছেন, বহরমপুরে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। ফিরতে রাত্রি হবে। হঠাৎ দোতলার অন্দর মহলে কী কারণে উত্তেজনা, লোকজনের হন্তদন্ত হয়ে ঘোরাঘুরি। আমিও চলি সেই-দিকে। ভেতরের দালানের গায়ে সারি সারি তিনখানি ঘর। মাঝের ঘরটি ঠাকুমার। সেইখানেই বাড়ির লোকজনের ভিড়। চাঞ্চল্য। দরজার

নিকট এগিয়ে যেতেই দেখি, একজন বেরিয়ে এলেন, হাতে ছোট কলাই করা গামলা—তাজা টক্‌টকে লাল রক্ত ভরতি! দেখেই আঁৎকে উঠি। উঃ! কতো রক্ত!

তখন সব ব্যাপারও জানতে পারি।

কদিন থেকে ঠাকুমার বাতের ব্যথা বেড়েছে। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। যথানিয়ম তাঁর দুপুরের ভাতের থালা নিয়ে খাটের পাশে টুলে বসে মা তাঁকে খাইয়ে দিচ্ছিলেন। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বড়ার অম্বল খাওয়াচ্ছেন। একগ্রাস খেয়ে ঠাকুমার ভাল লাগায় আবার বড়া চাইলেন 'বড়া' 'বড়্-আ'—বলতে বলতেই তাঁর কথা জড়িয়ে অস্পষ্ট হয়ে আসে—তারপরেই ঐ রক্তবমি! তখনি ডাক্তাররা এলেন। দেখলেন। শুনলাম, মস্তিষ্কে শিরা ছিঁড়ে ভীষণ রক্তক্ষরণ! রোগের নামও শুনি, সন্ন্যাস রোগ।

এরপরেই তাঁর সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে থাকা।

সবারই গভীর দুশ্চিন্তা—বাবা বাড়িতে নেই। আসবেন সেই রাত ন'টা-দশটায়! তাঁকে খবর দেবার বা তাঁর তাড়াতাড়ি চলে আসারও কোন উপায়ই নেই। ডাক্তারদের কতো কী চিকিৎসা চলতে থাকে। সকলেই অসীম উৎকণ্ঠায় বাবার আসার অপেক্ষা করতে থাকেন,—সবারই ভাবনা, ঠাকুমার ততোক্ষণ কি প্রাণ থাকবে? ডাক্তাররাও মোটেই ভরসা দেন না। সময়ও যেন কাটতেই চায় না।

চারিদিকে আত্মীয়-স্বজনদের খবর দেওয়া হয়। আমি ছুটি পিসেমহাশয়ের বাড়িতে। বেশ মনে পড়ে, সেই আমার প্রথম বাড়ির গেটের বাইরে একা কলকাতার রাস্তায় বার হওয়া। পিসেমহাশয়ের তখন বাড়ি ছিল হরিশ মুখার্জি রোডে, আমাদের বাড়ি থেকে দূরে নয়। তাঁরা সবাই তখনি চলে আসেন। বেঁকাদাও অবশ্যই এসে পেঁাছান—বিষাদভরা মুখে। এদিকে ঠাকুমার জীবনদীপ প্রায় নিভে আসে। ডাক্তার বার বার দেখছেন—প্রাণের ক্ষীণ লক্ষণ তখনও ধরা যায়।

ঘরের বাইরে, ভিতরে লোকে লোকারণ্য। বাইরে ঘরেও বন্ধুবান্ধব সবাই এসেছেন। সবারই উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষা, বাবা এসে কি তাঁর মাকে দেখতে পাবেন!

অবশেষে স্টেশন থেকে বাবাকে নিয়ে গাড়ী ফেরে।

হন্তদন্ত হয়ে বাবা ঘরে ঢোকেন। ঘরভরতি লোক, তবু নিঝুম নিস্তব্ধ। যেন সব পাষাণ মূর্তি।

মাথা হেঁট করে বাবা তাঁর মায়ের মুখপানে তাকান, তখনও দেহে মাঝে মাঝে অতি ক্ষীণ স্পন্দন রয়েছে। বাবা একবার অস্ফুটে ডাকেন—মা! সে কী কণ্ঠস্বর! সে ডাক এখনও যেন কানে শুনি!

কে যেন বাবাকে গঙ্গাজলভরা তামার পাত্র এগিয়ে দিয়ে বলেন, মায়ের মুখে একটু জল দিন!

এরপর মিনিট দুইও যায়নি, ঠাকুমার শেষ নিঃশ্বাস,—নিস্পন্দ দেহ।

এক বৃদ্ধা অস্ফুটে বলে ওঠেন, ভাগ্যবতী জননী, মাতৃভক্ত ছেলের হাতে শেষ জলটুকু পাওয়ার জন্যেই যেন তাঁর এতোক্ষণ অপেক্ষা করা!

সেকালের সমাজের বিধি ও দেশাচার

এ-'সেকাল' মান্ধাতার আমল নয়। রামায়ণ মহাভারতের যুগও নয়। মাত্র বছর সত্তর আগেকার কথা। আমার নিজের দেখা ঘটনা। আমাদেরই পারিবারিক জীবনে। ঘটনাটা তখন অবশ্য ভাসাভাসা কতক জানা, কতক দেখা। এখন সেই প্রসঙ্গের কয়েকটি চিঠিপত্রের আবিষ্কার হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ রূপটি আমার কাছে প্রকট হল। দেখি, পিতৃদেব আশুতোষের বহুল কর্মময় জীবনে সামাজিক প্রতিকূলতাও কম ভোগ করতে হয়নি!

আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলেন আমাদের দিদি—কমলা। জন্ম তাঁর ১৮৯৫ সালে। তখনকার দিনের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী তাঁর বিবাহ হয় মাত্র ন'বছর বয়সে—১৯০৪ সালে।

কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি বিধবা হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ। বাবা স্থির করেন, দিদির আবার বিবাহ দেবেন। সেইমত তাঁর আবার বিবাহও হয়,—১৯০৮ সালে। তেরো বছর বয়সে। কিন্তু, বিধির বিধান,—পরের বছরই—১৯০৯ সালে আবার তিনি স্বামীকে হারান। বিধবা বিবাহ শাস্ত্র অনুমোদিত হলেও এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অক্লান্ত ও বিপুল আন্দোলন সত্ত্বেও তখনকার সমাজ বিধবাবিবাহের পরিকল্পনাকে শ্রদ্ধা বা সহানুভূতির সঙ্গে দেখত না। দিদির সেই বিধবাবিবাহ দিতে পিতৃদেবকে যে প্রচণ্ড বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় সে-কাহিনীর বর্ণনা আছে—"শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যুপ্রসঙ্গ" বইখানিতে—পৃঃ ৪৫-৪৭।

সেই বিধবাবিবাহ দেওয়ার জের বারো বছর পরেও আরও কীভাবে আমাদের পারিবারিক জীবনে আবার দেখা দেয়, এই চিঠিগুলি তারই সাক্ষ্য।

আমাদের ছোটবোনের জন্ম ১৯০৮ সালে। তার বারো বছর বয়স হলে বিবাহের জন্য পাত্রের সন্ধান শুরু হয়। ১৯২০ সালে। জানুয়ারি মাস। আমি তখন কলেজের ছাত্র। দেখা যায়, বাড়িতে আনন্দের ঢেউ ওঠে। শুনি, অতি সুপাত্রের সঙ্গে বিবাহ তার স্থির হয়েছে। যেমন গুণবান পাত্র, তেমনি বংশ-গৌরবও। স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী অনুরূপা দেবীর পুত্র। অনুরূপা দেবী নিজেও তখন বাঙলা সাহিত্যের যশস্বিনী লেখিকা। তাঁর স্বামী শেখরনাথ বাবু মজঃফরপুরে ওকালতি করেন। তাঁরা সেইখানেই থাকেন। শীঘ্রই কলকাতায় আসছেন। পাত্রপাত্রীর আশীর্বাদ হবে। বাড়িতে বিয়েবাড়ির আনন্দ উথলে পড়ে। শুভকর্মের আয়োজন শুরু হয়। তারপর, হঠাৎ একদিন দেখি, কালো মেঘের ছায়া। বাবা-মা দাদাদের মধ্যে কী সব আলোচনা। এ-সবের মধ্যে আমি কখনও ঢুকি না। বুঝতে পারি, কিছু একটা ঘটেছে। তারপর শুনি, ওখানে বিয়ে হবে না,—ভেঙে গেছে। কেন? তা আর জানবার কৌতূহল হয় না। কেন না, কিছুদিন পরেই ছোট বোন রমলার বিবাহ স্থির হয়ে যায়—অবশ্য অপর এক সুপাত্রের সঙ্গে। আর, তাছাড়া বাড়িতে ইতিমধ্যে আর এক বিয়েরও তখন ধুম লেগে গেছে,—বড়দার বিয়ে মার্চ মাসেই।

অনুরূপা দেবীর পুত্রের সঙ্গে বিবাহের কথা ঠিক হবার পরও এভাবে ভাঙল কেন তার মূল কারণ এখন এই চিঠিপত্রের মধ্যে পরিষ্কার জানা যায়।

॥ ২ ॥

এই সংক্রান্ত নিম্নোক্ত যে চিঠিগুলি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে পিতৃদেবকে লেখা শেখরবাবুর চারখানি,—আর শেখরবাবুর পিতৃদেব ত্রৈলোক্যনাথবাবুর লেখা দু'খানি। শেখরবাবুর চিঠিগুলি ইংরেজিতে লেখা। ত্রৈলোক্যবাবুর দুটি বাঙলায়।

শেখরবাবুর ইংরেজি চিঠিগুলির সারমর্ম এই ঃ

৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৯ ঃ আপনার চিঠির জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাকে স্বীকার করতেই হয়, চিঠিখানি আমাকে গৌরব ও আনন্দ দান করেছে। হাঁ, আমার ছেলে অমি-র বিয়ের কথাবার্তা কিছুকাল থেকে চলছে, তবে কোথাও কিছু ঠিক হয়নি। আপনি কি আপনার কন্যার কোষ্ঠী যথাসত্বর পাঠাতে পারেন? আমি ও আমার পরিবারবর্গ আমাদের সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই যাঁর পরামর্শের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে চলি তাঁকে সেটি দেখাতে চাই।

তারপর, কাশীর সেই শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত ঋষিপ্রতিম দর্শন-শাস্ত্রজ্ঞের বিশদ পরিচয় জানিয়ে শেখরনাথবাবু লেখেন ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে এ-বিষয়ে তাঁদের কথাও হয়েছে এবং তিনি কোষ্ঠীটি নিজে বিচার করে দেখতে ইচ্ছুক।

এর পর, পুত্র অমির বয়স, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার কতোদূর কী শিক্ষালাভ হয়েছে, ভবিষ্যতে সে কি করতে চায় ইত্যাদি জানিয়ে লেখেন, বড়দিনের ছুটিতে সে কলকাতা যাচ্ছে এবং সেখানে শেখরনাথবাবুর ভাই তাকে সঙ্গে নিয়ে আমার পিতৃদেবের কাছে তার শ্রদ্ধা জানাতে আসবে।

দ্বিতীয় চিঠির তারিখ ৫ই জানুয়ারি, ১৯২০।

শেখরনাথবাবু জানাচ্ছেন, ১লা মজঃফরপুরে ফিরেছি। অমির ঠিকুজি পাঠাতে বলেছিলেন। এইসঙ্গে পাঠালাম। এর চেয়ে বড় কোষ্ঠী তার তৈরি নেই, আপনি চান ত তৈরি করে পাঠাতে পারি।

তৃতীয় চিঠি— ২৬শে জানুয়ারি '২০।

গতকাল আমার স্ত্রী ফিরেছেন। তাঁর কাছে আপনার অসুস্থতার খবর পেয়ে আমরা সবাই দুশ্চিন্তিত রইলাম। আশা করি এতোদিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন। আমার স্ত্রী আরও জানালেন, আপনার কন্যাকে দেখানোর ও দেনাপাওনা বিষয়েও জানাবার জন্যে আপনি প্রস্তাব করেছেন। এ সম্পর্কে জানাই, আমাদের কয়েকজন আত্মীয়া তাকে দেখেছেন, তাঁদের কাছে যা শুনেছি এবং আমিও যখন আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই, তখনও আপনি যা বলেছিলেন, তাইতেই জানাচ্ছি, আমি ও আমার স্ত্রী এ ব্যাপারে পরিতৃপ্ত। আর, দেনা-পাওনা সম্পর্কেও অবশ্যই আমাদের কোনও দাবিদাওয়া নেই। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বছর স্টেট স্কলারশিপ দেওয়া হবে। অমি আমাদের জানিয়েছে, চেষ্টা করলে সে হয়ত পেতে পারে। কিন্তু আমরা চাই না সে বিলেত যায় এবং সে অভিমত দেব না। বিবাহটা যাতে তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয় আমরা তার জন্যে খুবই আগ্রহী, কিন্তু আরও দুই সপ্তাহ সময় আমাকে দিন যার মধ্যে সব ব্যবস্থা করতে পারব আশা করছি। এ জীবনে আমার বহু আশাই ফলবতী হয়নি, কিন্তু একান্ত কামনা করি এবারকার এইটি যেন পূর্ণ হয়।

চতুর্থ চিঠিটি দুদিন পরেই লেখা,— ২৮শে জানুয়ারি ১৯২০। চিঠির মাথায় লাল কালিতে ৺ চিহ্ন আঁকা।

আপনাকে জানাই, আমার পুত্র অমির সঙ্গে আপনার সর্বকনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের প্রস্তাব ধন্যবাদের সহিত আমরা স্বীকার করলাম। এই মাঘমাসে বা যতশীঘ্র আপনি চান বিবাহের অনুষ্ঠানে আমরা ইচ্ছুক। আপনার কাছ থেকে উত্তর পেলেই মা লক্ষ্মী (আপনার কন্যা)-কে আশীর্বাদ করতে কলকাতা যাব। ভরসা করি আপনি এতদিনে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং মা লক্ষ্মী ও আর সকলেও ভাল আছেন। তাড়াতাড়ি চিঠির উত্তর পাবার প্রতীক্ষায় রইলাম। শ্রদ্ধাসহ

স্নেহভাজন
শেখর

॥ ৩ ॥

এরই এক সপ্তাহ পরেই ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯২০ সালে মজঃফরপুর থেকে বাঙলায় লেখা শেখরবাবুর পিতা ত্রৈলোক্যবাবুর এই চিঠিখানি ঃ

শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায়

মোজফরপুর
৪/২/২০

সাদর সম্ভাষণ পুরশর নিবেদন

আমার পুত্র শিখরনাথকে লিখিত আপনার পত্রে জানিলাম যে আমার পৌত্র শ্রীমান অম্বুজনাথের সহিত আপনার কনিষ্ঠা কন্যার শুভবিবাহ সম্বন্ধ একপ্রকার স্থির করিয়াছেন ও আগামী ফাল্গুন মাসে শুভকার্য্য সম্পন্ন করাইতে ইচ্ছুক আছেন। এ সংবাদে আমি নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি জানিবেন, তবে এ সম্বন্ধে আমাদিগের যেটুকু বলিবার আছে তাহাই আপনাকে জানাইতেছি।

আমার পৌত্রের বিবাহ আমার পৈতৃক বাটী উত্তরপাড়া হইতেই সম্পন্ন করিতে হইবে। যেহেতু তথায় এখনও আমার বৃদ্ধা মাতা এবং শৈশবে মাতৃহীন আমার সন্তানগণের পালনকর্ত্রী আমার ভগিনি প্রভৃতি পরিজনবর্গ আছেন। তদ্ভিন্ন আমার মধ্যম ভ্রাতাও সেখানে বাস করেন। আমাদের সমাজের বিষয় আপনি সমস্তই অবগত আছেন। এ সম্বন্ধে আর অধিক জানান নিষ্প্রয়োজন। আমরা শুনিয়াছি যে আপনি শাস্ত্রসম্মতভাবেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন এবং এই কথাই আমরা সকলকে বলিতেছি। কিন্তু বাস্তবিকই উহা যথার্থ কিনা এবং সেই কার্য্য কবে এবং কোন পণ্ডিত প্রভৃতির সহায়তায় সম্পন্ন হইয়াছে, কোন উচ্চাঙ্গের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহাতে নিমন্ত্রিত ছিলেন, এ সকল বিষয়ে কিছুই জানা না থাকায় কাহারও কূট প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ না হইয়া অপ্রতিভই হই এবং লোকে এমনও বলে যে ইহা যে বলিয়াছে তাহা অনুমানমাত্র, বাস্তব হইলে অনেকেই এ সম্বাদ জানিত। আমাদের পক্ষ হইতে এ সকল বিষয়ে আগ্রহ থাক না থাক, আমি এবং আমার পুত্র ও পুত্রবধূ আপনার একান্ত পক্ষপাতী ও আপনার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইলেও হিন্দুর

বিবাহ প্রভৃতি কার্য্য কেবলমাত্র আপনাদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। নিকট কুটুম্ব ও আত্মজনের সন্তোষেরও প্রয়োজন ঘটে। অন্যের কথা ছাড়িয়া দিই, অমির মাতামহ শ্রীমুক্ত মুকুন্দবাবু আপনার প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইলেও যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেকে এ বিবাহে সম্মতিদান করেন নাই। অমি বলিতে গেলে আমার একমাত্র বংশধর (অপর একটি ৩ বৎসরের শিশু)। অমির বিবাহে তাহার পূজনীয় গুরুজন সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া যোগদান করেন ও বর কন্যাকে অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করেন, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। যেহেতু গুরুজনের মনঃক্ষোভ হিন্দুর চিত্তে প্রত্যবায়ের আশঙ্কা আনয়ন করে। অমি এক্ষণে যেমন আমাদের তেমনি আপনারও। উহার সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ যাহাতে হয় আপনি স্বতঃই তাহা চিন্তা করিবেন।

আপনার সন্তান বাৎসল্য যে অপরিমেয় ইহা সর্ব্বজনবিদিত এবং সেইজন্যই পূর্ব্বাবধি আমরা আপনার সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ও আপনার হৃদয়ের সহিতও পরিচিত। এক বৎসর কন্যার জন্য যখন আপনি সর্ব্ববিধ দুঃখ সহ্য করিয়াও যাহা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন, তাহাতেও বিরত হন নাই, তখন আর একটা সন্তানের জন্য, আরও একবার ত্যাগ স্বীকারের মহত্ব প্রদর্শন করিতেও পারেন, এ আশা কি আমাদের অসঙ্গত বলিবেন? এই বিবাহের পূর্ব্বে সম্মানিত জনকয়েক উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে মর্য্যাদা দান ও শাস্ত্রবিহিত একটা বৈধ প্রায়শ্চিত্ত করা হইলে তাহা সাধারণ সকলেই জানিতে পারে এবং আমাদের আত্মীয় জন হইতে বিচ্ছিন্নাদি হইতে হয় না. এবং আমরা যথার্থই আপনার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিয়া এই একান্ত ঈপ্সিত শুভ বিবাহ অতিশয় আনন্দের সহিতই সুসম্পন্নার্থ যত্নবান হইতে পারি। শুনিয়াছি আপনি কাহারও প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। এক্ষণে আমারও এই একান্ত অভিলাষটি পূর্ণ করিয়া, আশুতোষ নামের সার্থকতা দেখান। আপনার সম্মান ইহাতে বর্দ্ধিত ভিন্ন হ্রাস কখনই হইতে পারে না এবং সমুদয় উচ্চ হিন্দু সমাজ ও গুণগ্রাহী বিদ্বৎ মণ্ডলী নিঃসন্দেহ ইহাতে আপনার গুণকীর্ত্তনই করিবেন। ইহা আমি উত্তমরূপে অবগত হইয়াই লিখিতে ভরসা করিতেছি যে এইরূপ একটা প্রায়শ্চিত্ত হইলেও সকলেই এ বিবাহে সম্মিলিত হইয়া আনন্দ করিবেন।

সাধারণ সামাজিক ব্যক্তিবর্গের কথা ধরিতেছি না।

আপনার প্রয়োজনবোধ না থাকিলেও অন্তত আমাদেরই জন্য পিতৃস্থানীয় বৃদ্ধের এই প্রার্থনাটি আপনাকে পূরণ করিতেই হইবে। আপনি আমার সন্তানস্থানীয়, আপনার উপর আমার এই দাবি আছে। ইহাই আমার পৌত্রের বিবাহে একমাত্র যৌতুক আমি আপনার নিকট মিনতিপূর্ব্বক চাহিতেছি।

আপনার নিকট জানাইতে আমার দ্বিধা নাই যে আমার পৌত্র অম্বুজের মনোভাব যতদূর বুঝা যায় তাহাতে এ বিবাহে তাহারও বিশেষ আগ্রহ আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে অন্যস্থানে বিবাহের কথায় যেরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিত এক্ষণে সে ভাব নাই। বরং কলিকাতায় পড়িতে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছে। আপনার মনেও তাহার প্রতি স্নেহ সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক। উহার জন্যও এই ত্যাগ স্বীকারটুকু করুন। হিন্দুকে রোগে শোকে সর্ব্বদাই তো প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। আপনাকে হিন্দুয়ানি সম্বন্ধে কোন কথা লেখাই আমার বাহুল্য। আপনি তো সকলই জানেন।

ঈশ্বর আপনাদিগকে সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে রাখুন। আশা করি আমায় নিরাশ করিবেন না। আপনার পত্র পাইলেই, পাত্র আশীর্ব্বাদের ব্যবস্থা করাইব। এখানের এক প্রকার কুশল। অমি বাকিপুরে কুশলে আছে।

আশীর্ব্বাদক ও কুশলাকাঙ্ক্ষী

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

Magufferpore P. O.

পিতৃদেব এ-চিঠির যে উত্তর দেন তা অবশ্য পাওয়া সম্ভব হয় না, তবে ত্রৈলোক্যবাবুর পরের চিঠিটি ১৪ই মার্চ তারিখের এই ঃ

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়

মোজফরপুর

১৫/৩/২০

সবিনয় নিবেদন

অতিশয় দুঃখিতান্তকরণে এই পত্র আপনাকে লিখিতেছি।

শ্রীযুক্ত মুকুন্দবাবুর শেষ সিদ্ধান্তের মর্ম্ম এইরূপ। এদেশে সমাজের বিধি ও দেশাচারের প্রাধান্য অধিক। দেশাচারের বিরুদ্ধে

বিবাহের জন্য কলিকাতায় নাই হোক ৺কাশীধামে তেজস্বী শাস্ত্রজ্ঞ দুইএকটি পণ্ডিতের সহায়তায় যদি প্রায়শ্চিত্ত করা হয় তবে মুকুন্দবাবুও নিজের জ্ঞাতাজ্ঞাত ভুলভ্রান্তির জন্য একত্রে আপনার সহিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত আছেন। তার পর বিবাহে তাঁহার অমত নাই। কিন্তু তাহা না হইলে তাঁহার কন্যা জামাতা ও তাঁহাদের সন্তানগণ তাঁহার অত্যধিক প্রিয় হইলেও সমাজ ধর্ম অনুসারে তাঁহারা বর্জ্জনীয়।

অম্বুজের মাতা এ বিবাহ সম্বন্ধে অত্যন্ত ইচ্ছুক থাকিলেও পিতৃকুলের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে কিছুতেই সম্মতা নহেন।

অমির এ বিবাহে অত্যন্ত আগ্রহ জানিয়া তাহারই জন্য বাধাবিপত্তির মধ্যেও এ বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়া অতদূর অগ্রসর হই; কিন্তু মায়ের মনে একান্ত আঘাত দিয়া এ বিবাহ দেওয়া সঙ্গত ও সম্ভব মনে করিতে পারিতেছি না। আপনার নিকট আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

এ সমস্যার যাহা সমাধান তাহা যখন সম্ভব নয়, তখন আর কি করা যাইবে যাহা বিধি নির্ব্বন্ধ তাহাই হউক। আমরা বুঝিতেছি যে এ বিবাহ না হইলে হয়ত অম্বুজের জীবন দুঃখময় হইয়া যাইবে। কারণ এ বিষয়ে তাহার চিত্ত অতিশয়ই উৎসুক হইয়াছিল—কিন্তু উপায় কি? আশীর্ব্বাদ করিবেন সে যেন ক্রমে বিস্মৃত হয় ও ভবিষ্যৎ জীবনে আবার শান্তি লাভ করে।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনাদের কুশল হউক ও আপনার কন্যা যেন চিরসুখী হয়।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই চিঠিতে অনুরূপা দেবীর পিতা "মুকুন্দবাবুও নিজের জ্ঞাতাজ্ঞাত ভুলভ্রান্তির জন্য একত্রে আপনার সহিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত আছেন''—কথাগুলির নিহিতার্থ বোঝা গেল না।

যাই হোক, বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েও এবং উভয় পক্ষেরই বিবাহে একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, এইভাবেই ভেঙে যায়—কেবলমাত্র "দেশে সমাজের বিধি ও দেশাচারের প্রাধান্য''র প্রভাবেই—সেই ১৯২০ সালেও।

মুকুন্দদাস

"দেশ" পত্রিকায় "অ্যালবাম" পর্যায়ে "আশুতোষের লাইব্রেরী" শিরোনামায় আমার একটি লেখা বার হয়। এক পাঠক সেই প্রবন্ধটি পড়ে আমাকে সুন্দর একটি চিঠি লেখেন। তাঁর অনেকদিনের এক ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন হোল বলে কৃতজ্ঞতা জানান।

পত্রলেখকের চিঠির "লেটার হেড্" থেকে জানা যায়, ব্রিটিশ রাজত্বকালে তিনি বিদেশে সরকারী অফিসার ছিলেন, এখন থাকেন দক্ষিণ কলকাতায়। তাঁর পত্রের মর্ম ছিল এই।

ছেলেবেলায়—বছর ষোল বয়স পর্যন্ত তিনি পূর্ববাংলার এক পাড়াগাঁয়ে মানুষ হন। সেই অজ গাঁয়ে সারাবছর ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জনের চাঞ্চল্যজনক আকর্ষণ বলতে কোন কিছুই ছিল না, কেবল মাত্র উত্তেজনা জাগত যখন বছরে কোন যাত্রাদল এসে হাজির হোত, আর তারই মধ্যে সব চেয়ে বেশি উদ্দীপনার সৃষ্টি করত মুকুন্দদাসের যাত্রা। মুকুন্দদাস যাত্রাগান করতে করতে মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ করে বক্তৃতা দিতেন,—তাদের চরিত্রবান ও শিক্ষিত হতে হবে নির্ভীক হয়ে স্বদেশের সেবা করতে হবে,—এই ধরনের সব উপদেশ, এবং আশুতোষের নাম উল্লেখ করে বলতেন,—

তাঁর মত মানুষ হতে হবে। একবার তিনি যাত্রাভিনয়ের মাঝে তাঁর বক্তৃতায় বলেন, সে-বছর কলকাতায় আশুবাবুর বাড়িতে আমার যাত্রাগান হয়। পরদিন তাঁর সঙ্গে তাঁর বিশাল লাইব্রেরী যখন ঘুরে ঘুরে দেখছি, আমি সসঙ্কোচে তাঁকে প্রশ্ন করি, এই যে এতো বই, এ কী সব আপনি পড়েছেন? তিনি তখনি উত্তর দিলেন, আপনি যে কোন বই বার করে তা থেকে পড়ে শোনান, আমি বলে দিতে পারব ওটা কোন্ বই থেকে পড়ছেন। মুকুন্দদাসের এই উক্তি শুনে পত্রলেখক বিশ্বাস করতে পারেননি যে আশুতোষের সেই দাবী যথার্থ হতে পারে। এই ঘটনা ঘটে পত্রলেখকের বাল্যকালে যখন তাঁর বয়স বছর পনেরো ষোল এবং আমাকে চিঠি লেখার সময় তাঁর ৭৫/৭৬ বছর বয়স। পত্রলেখক স্বীকার করেন, তাঁর এই অবিশ্বাসের ফলে তিনি স্বদেশে বিদেশে নিজেদের আড্ডার মজলিসে এই নিয়ে এতোকাল হাসিঠাট্টা করে এসেছেন, এখন "আশুতোষের লাইব্রেরী' প্রবন্ধটি পড়ে তাঁর সেই ভুল ধারণা ভাঙায় আমাকে ধন্যবাদ জানান।

পিতৃদেবের জীবিতকালে আমাদের বাড়িতে মুকুন্দদাসের সেই সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাভিনয়ের যে স্মৃতি আমার এখনও রয়েছে তারই বিবরণ দিই।

কিন্তু, তার আগে মুকুন্দদাসের জীবনী সংক্ষেপে জানানোর হয়ত প্রয়োজন।

মুকুন্দদাসের পিতৃদত্ত নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর। তাঁর পিতা গুরুদয়াল দে বরিশাল শহরে চাকরি করতেন, একটা মুদীর দোকানও চালাতেন। তাঁদের আদিনিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার বানরীগ্রামে। যজ্ঞেশ্বরের জন্ম ১৮৭৮ সালে। কৈশোরে তিনি ছিলেন দুর্দান্ত,— ডানপিটে। মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে এন্ট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত পড়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিলেও অশ্বিনীকুমারের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও দেশপ্রেম তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। যজ্ঞেশ্বর ছিলেন সুকণ্ঠ ও সুগায়ক। অশ্বিনীকুমারের প্রেরণায় তাঁর চারণ কবি হওয়া।

১৯০০ সালে শ্যামাপূজার রাত্রে অবধূত রামানন্দ হরিবোলানন্দ গোস্বামী নামে এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর কাছে যজ্ঞেশ্বর দীক্ষা নেন। নতুন নামকরণ হয়—মুকুন্দদাস। পরে তিনি শক্তিমন্ত্রেও দীক্ষিত হন।

মুকুন্দ দাস নিজে গান রচনা করতে পারতেন এবং একটি যাত্রাদল

গড়ে তোলেন। তাঁর প্রথম যাত্রাপালা—মাতৃপূজা। তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলেছে। স্বদেশী যুগ। ব্রিটিশ সরকারের কড়া শাসন। তারই মধ্যে নির্ভীক মুকুন্দদাস তাঁর যাত্রাগানের মাধ্যমে দেশপ্রেম ও সমাজচেতনা জাগিয়ে তোলার মহান ব্রতে ব্রতী হলেন। মাতৃমন্ত্রপ্রচারে দলবল নিয়ে তিনি নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে নৌকাযোগে ঘুরতে থাকেন। তাঁর সেই মাতৃপূজা পালাগান দেশবাসীদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। আর, সেই যাত্রাগানের কী ক্ষুরধার শাণিত ভাষা! মুকুন্দদাস গ্রামে-শহরে গেয়ে বেড়ান ঃ

বাবু বুঝবে কি আর মলে!
কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে, একদম দফা সারলে।
খেতে ভাত সোনার থালে,
নাউ সেটিস্‌ফাইড স্টীলের থালে,
তোদের মত মূর্খ কি আর, দ্বিতীয়টি মেলে।

....

ছিল ধান গোলাভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সারা,
চোখের ঐ চশমা জোড়া, দেখ্‌ না তোরা খুলে।
কুল নিয়েছে, মান নিয়েছে, ধন নিতেছে কলে,
ডু ইউ নো, বাঙালী বাবু—
ইওর হেড্‌ ফিরিঙ্গীর বুটের তলে ॥

আবার,—

আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম
তবে ফিরিঙ্গী বণিকের গৌরব-রবি
অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম ॥
শোন সব ভাই স্বদেশী,
হিন্দুমোছলেম্‌ ভারতবাসী!
পারি কিনা ধরতে অসি,
জগৎকে তা দেখাইতাম ॥
কথা শুনে প্রাণ যদি মজে,
সেজে আয় বীর সাজে।

দাস মুকুন্দ আছে সেজে,

দাঁড়ি পেলে তরী ভাসাইতাম ॥

তাঁর প্রাণ-মাতানো সেই সব স্বদেশী গান শুনে গ্রামবাসীরা মেতে ওঠে। দিকে দিকে মুকুন্দদাসের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। দেশবাসীর মনে তাঁর যাত্রাগানের সেই প্রচন্ড প্রভাব দেখে ব্রিটিশ শাসক সরকার সন্ত্রস্ত হয়, তাঁর যাত্রাভিনয় বন্ধ করার জন্যে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করে। মুকুন্দদাস তাতে ক্ষান্ত হন্ না। পুলিসকে এড়িয়ে নৌকাযোগে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরতে থাকেন। তাঁর যাত্রাগান সমানে চলতে থাকে। অবশেষে, রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে একদিন তিনি গ্রেপ্তার হন। 'মাতৃপূজা'র পান্ডুলিপি ও তার গানের সংকলন পুস্তকগুলি বাজেয়াপ্ত হয়। বিচারে তাঁর তিনবছর সশ্রম কারাদন্ডও হয়।

কারাবাস থেকে বার হয়ে মুকুন্দদাস কিছুকাল পরেই আবার যাত্রাদল গড়ে অভিনয় শুরু করেন। "মাতৃপূজা"র পান্ডুলিপি বাজেয়াপ্ত থাকলেও নতুন নতুন পালাগান রচনা করে অভিনয় চালান। জাতীয় ভাবধারা ও সামাজিক চেতনা সঞ্চারে দেশবাসীকে জাগিয়ে তোলার কাজে মাতেন।

কলকাতাতেও এসে তিনি যাত্রাভিনয় করেন। একবার 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে' তাঁর যাত্রা। পিতৃদেবও সেখানে উপস্থিত। গান শুনে পরিতুষ্ট হয়ে তাঁকে একখানি লাঠি উপহার দেন্। তাতে খোদাই করে লেখা—

যে রাখে আমায় তার হয় না বিপদ।

মুকুন্দের সখা আমি মূর্খের ঔষধ ॥

সেই বহুখ্যাত দেশপ্রেমিক মুকুন্দদাস এলেন যাত্রা করতে আমাদের বাড়িতে পিতৃদেবেরই আমন্ত্রণে। সে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। পিতৃদেবের আমলে বাড়িতে সেই একবারই যাত্রাভিনয়ের আসর।

ঠিক কোন্ সালে মনে নেই। ১৯২০-২১ হবে। আমি তখন কলেজে পড়ি। সে-সময় চলেছে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা। সেই পরিবেশে হাইকোর্টের জজ-এর বাড়িতে মুকুন্দদাসের যাত্রা।

৭৭, রসা রোড-এ আমাদের সাবেক বাড়ির দক্ষিণে খালি জমির উপর চারতলা নতুন অংশ উঠেছে। দোতলায় দুই অংশের সংলগ্ন

ছাদ,—নিচে বার বাড়ির গেট ও গাড়ি-বারান্দা। সেই খোলা ছাদের মাথায় চারতলা উঁচুতে শামিয়ানা খাটানো হয়। অতো উঁচুতে খাটানোর কারণ সেই ছাদের ওপর তিনতলায় তিনদিকে লম্বা বারান্দা। সেখানে পর্দানশিন মেয়েদের বসবার জায়গা। পর্দা ফেলে নয়, ওপরে রেলিং এর আড়ালে বসে দেখা। দোতলার ছাদে হবে যাত্রা। দক্ষিণে নতুন বাড়ির ঘরে অভিনেতাদের সাজঘর। ছাদের পশ্চিমে বড় রাস্তার দিকেও একটা শামিয়ানা ঝুলিয়ে ছাদটাকে যেন একটা প্রকাণ্ড হল-ঘরে পরিণত করা হয়েছে। অভিনয় হবে আসরের মাঝখানে,—চারপাশ ঘিরে শ্রোতারা বসবে,—শুধু সাজঘর থেকে যাতায়াতের একটু পথ ছেড়ে রেখে।

পরিচিত মহলে মেয়েপুরুষ যাঁরাই খবর পেয়েছেন এসে আসর জমিয়েছেন। একপাশে খান কয়েক চেয়ার পাতা—বাবা কয়েকজনকে নিয়ে বসে। ছাদে ও ওপরের বারান্দায় আর তিলধারণের জায়গা নেই। ছাদের আসরেও একপাশে কিছু মহিলা শ্রোতারা বসে। আশপাশের ঘরের দরজা জানলায়ও শ্রোতারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে।

অভিনয়ের ছাপা প্রোগ্রাম বিলি করা হয়েছে। পালা—'কর্মক্ষেত্র' যার মূল বিষয় কর্মযোগের মাধ্যমে মায়ের সাড়া মিলবে,—দেশের কাজে সবাই লাগো। শুনেছি, তারই মধ্যে মুকুন্দদাস তাঁর বাজেয়াপ্ত নাটক "মাতৃপূজা"রও দু'একটা গান গাইবেন।

শুরু হয় ঐকতান—তারপর মূল নাটক।

আজ মনে নেই সেই অভিনয়ের অনেক কিছু. কিন্তু এখনও ভুলিনি মুকুন্দদাসের চেহারা, তাঁর সাজপোশাক, তাঁর আবেগময় জলদগম্ভীর কণ্ঠে গান ও তাঁর ভাষার উন্মাদিনী শক্তি। সেদিন আসরে তাঁর প্রবেশের চেহারা ও ভঙ্গী এখনও চোখের উপর ফুটে ওঠে। সাজঘর থেকে বার হলেন—যেন, প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা! বাউলের বেশ। বাবরী চুল। পরনে গেরুয়া আলখাল্লা। কোমরে পাকিয়ে বাঁধা গেরুয়া চাদর। মাথায় গেরুয়া প্রকাণ্ড পাগড়ি। তেমনি সুগঠিত বিশাল দেহ—মল্লবীরের মত। আসরের দিকে এগিয়ে আসেন বীরদর্পে, যেন রণাঙ্গনে,—উদাত্ত কণ্ঠে গান গেয়ে

"এসেছে ভারতে নব জাগরণ,
পেয়েছে ভারত নূতন প্রাণ

মাতৃমন্ত্রে লয়েছে দীক্ষা
জগতে শিক্ষা করিবে দান ॥
স্তম্ভিত করি বিশ্বমানবে
শিষ্য করিবে জগৎখান—
কহিছে সে আজ পুণ্যবারতা
শোন রে সকলে পাতিয়া কান।…”

তাঁর সেই প্রাণ-মাতানো গানে সারা অঙ্গে শিহরণ জাগায়, সারা আসরে যেন বিদ্যুৎ চমকায়। এর পর, নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে মাঝে মাঝে হঠাৎ সেই বাউলের প্রবেশ, আর প্রাণ-উদ্দীপক সঙ্গীত, দেহ দুলিয়ে, নেচে নেচে, আসর কাঁপিয়ে। তারি মাঝে হঠাৎ কখন থেমে যাওয়া, খানিক বক্তৃতা। সে-বক্তৃতা অবান্তর নয়। নাটকের কাহিনী ও গানের পদের সঙ্গে দেশের সাময়িক পরিস্থিতি বা কোন ঘটনা মিলিয়ে অভিনয় আরও জীবন্ত করে তোলা। সে সময়ে দেশে নারী-জাগরণ ও বিদেশীপণ্য বর্জনের সাড়া জেগেছে। তিনিও মহিলা শ্রোতাদের দিকে ফিরে, যেন তাঁদেরই ডেকে, গেয়ে ওঠেন ;

“ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী
কভু হাতে আর পরো না।
জাগ-গো ও-জননী ও-ভগিনী
মোহের ঘুমে আর থেকো না।”

শুধু স্বদেশী গানই নয়, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ দূর করারও ডাক দেন, এক মুসলমান চরিত্রের নায়কের সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে গান ধরেন,

রাম রহিম না জুদা করো ভাই
মনটা খাঁটি রাখো জী।
দেশের কথা ভাব ভাইরে,
দেশ আমাদের মাতাজী ॥
হিন্দুমুসলমান এক মায়ের ছেলে
তফাৎ কেন করোজী,
দু'ভায়েতে দু'ঘর বেঁধে
করি একই দেশে বসতি ॥
টাকায় ছিল একমণ চাউল,
ভাই, এখন বিকায় পশারী,

এর পরেতে হতে হবে ঐ
গাছের তলায় বসতি ॥

তারপর, দেশের প্রাণস্বরূপ কৃষকদের জয়গান করেন বাউল —

ধন্য এ দেশের চাষা,
এদের চরণ-ধূলো পড়লে মাথায়,
প্রাণ হয়ে যায় খাসা ॥

কখনো বা যেন দেশবাসীকেই ডাক দিয়ে গেয়ে ওঠেন ঃ

পণ করে সব লাগরে কাজে,
খাটবো মোরা দিন কি রাত।
বাংলা যখন পরের হাতে
তখন কিসের মান আর
কিসের জাত ॥
এমন করে পরের হাতে,
বিকিয়ে দিলি সোনার দেশ,
ধিক্ বাঙালী নীরব রইলি
থাকতে চৌদ্দ কোটি হাত ॥

এমনি আরও কতো গান। পালাভিনয়ের তাঁর সর্বশেষ গান গাইতে তিনি আসরে নামেন বিশাল বুকে এক রাশ সোনা ও রূপার পদক ঝুলিয়ে। বাউলের সে যেন রাজবেশ। সেই বেশে হেলেদুলে গান গাইতে থাকেন। বুকে মেডেলগুলি আসরের বিজলী আলোয় ঝকমক করে,—যেন অগ্নিমন্ত্রের পূজারী শতদীপ ধরে দেশমাতার আরতি করেন, সারা আসর স্তব্ধ বিমুগ্ধ হয়ে শোনে ও দেখে!

অভিনয় শেষ হয়। নিস্তব্ধ সভায় তখনও যেন গানের সুর প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। পিতৃদেব উঠে এগিয়ে আসেন। মুকুন্দদাসের কণ্ঠে আর একটি স্বর্ণপদক পরিয়ে দিয়ে তাঁকে বুকে নিয়ে আলিঙ্গন করেন। সে-দৃশ্য কী কখনও ভোলা যায়!

আরও মনে আছে, পরদিন সকালে মুকুন্দদাসকে নিয়ে বাবা বইভর্তি ঘরে ঘরে ঘোরেন, তাঁর লাইব্রেরী দেখান। আর আমি? মুকুন্দদাসের যাত্রাদলের এক সঙ্গীকে নিয়ে একান্তে এক ঘরে বসি, বাজেয়াপ্ত 'মাতৃপূজা' নাটকের কয়েকটি নিষিদ্ধ গান তাঁর কাছে শুনে লিখে রাখি।
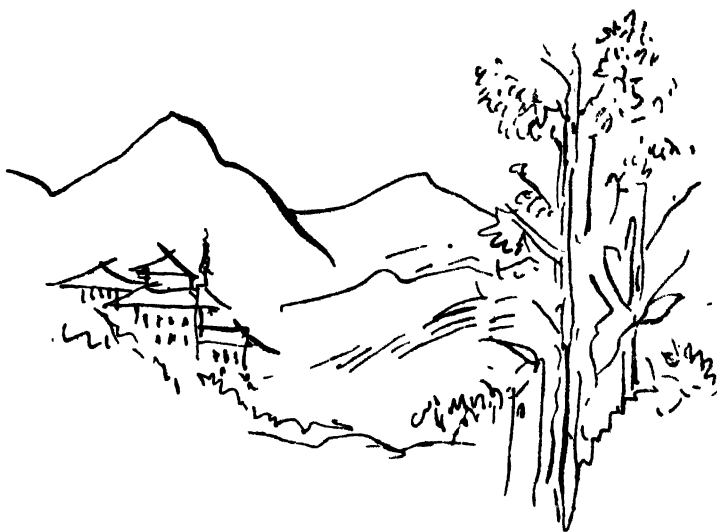
নিরুদ্দেশের সন্ধানে

অনন্ত বিস্ময় ও রহস্যে ভরা গিরিরাজ হিমালয়। তাঁকে ঘিরে মানুষের মনে কতো বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রশ্ন। অনেকেই সন্ধান নিতে আসেন সেখানকার সাধুসন্ন্যাসীদের সম্পর্কে। পুণ্যকামী যাত্রীরা জানতে চান দুর্গম তীর্থস্থানগুলির সন্ধান। প্রকৃতিপ্রেমিক ভ্রমণ-পিপাসী মন খোঁজে হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে কতো অজানা পথের সন্ধান। দুঃসাহসী অভিযাত্রী যাত্রা করে কোথায় কোন্ এক গগনস্পর্শী শিখর জয়ে। কেউ বা এসে প্রশ্ন করেন, কর্মজীবনে অবসর নিয়ে কোন্ অঞ্চলে মনের শান্তিতে বাকি জীবন কাটানো যায়? আবার, কখনো হয়ত কোন আত্মীয় স্বজন হিমালয়ে সন্ধান পেতে আগ্রহী তাঁর কোন গৃহত্যাগী নিরুদ্দেশ প্রিয়জনের।

সেই শেষোক্ত শ্রেণীর অনুসন্ধানকারীর তিনটি কাহিনী শোনাই।

॥ এক ॥

শৈলেনবাবু ছিলেন সেকালে আইনের কৃতী ছাত্র। কর্মজগতে প্রবেশ করে সাব্‌জজ হন্। আমার পিতৃদেবেরও প্রিয়পাত্র ছিলেন।

আমার দাদাদের সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমার চেয়ে তিনি ছিলেন বয়সে অনেক বড়। তাই আমাকেও তিনি প্রীতি ও স্নেহের চক্ষেই দেখতেন—ছোট ভাই-এর মত।

আজ থেকে বছর তিরিশেক আগের কথা। তখন তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। কলকাতায় নিজের বাড়িতে থাকেন। আমিও সেসময় হিমালয় থেকে ফিরেছি দিন কয়েকের জন্য। একদিন তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন, আমাকে দেখতে পেয়ে বলেন, এই যে ভাই তুমি এসেছ! চল, তোমার সঙ্গে একান্তে একটু কথা আছে।

তারপর, ঘরে এসে বসেন, বলেন, ভাই, তুমি জান কিনা জানি না, একটা গভীর অনুশোচনায় আমার মনে কষ্ট পোষণ করছি বহু বছর ধরে। আমার বড় ছেলেটি যেবার ম্যাট্রিক দেবে, পরীক্ষার কদিন আগে বাড়ি থেকে হঠাৎ চলে যায়। তারপর বহু অনুসন্ধান করেও তার কোন খোঁজ পাইনি। আমার বিশ্বাস, সে সাধু হয়ে গেছে। তুমি তো ভাই হিমালয়ে ও অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রে কতো ঘুরছ, তার সঙ্গে তোমার কোথাও কি যোগাযোগ হয়েছে বা তাকে দেখেছ?—এই দেখ ভাই তার ফটো।—

তিনি সজল চোখে একটি বহু পুরানো ছোট ফটো তাঁর পকেট থেকে মনিব্যাগটা বার করে তাই থেকে সযত্নে খুলে আমার হাতে দেন।

ঘটনাটা আমার জানা ছিল না। তাই জিজ্ঞাসা করি, কতো বছর হোল সে চলে গেছে?

তিনি বলেন, তা' বছর পঁয়ত্রিশ হয়ে গেল। ঐভাবে হঠাৎ তার চলে যাওয়ায় আমার মনোকষ্ট যা তাতো আছেই কিন্তু অনুশোচনা কেন তাও বলছি। সেদিন হয়েছিল কি জান? একটা সামান্য ঘটনার জন্যে তাকে খুব বকি—হয়ত তার অপরাধের তুলনায় শাসনটা অনেক বেশিই হয়েছিল—আমার হঠাৎ রাগের বশেই। তার কিছু পরে রোজ সকালে আমি যেমন নিত্য গঙ্গাস্নানে যাই সেদিনও বার হয়ে গেলাম। যাবার আগে দেখলাম সে তার পড়ার ঘরে বসে বই নিয়ে মুখ গুঁজে পড়ছে। গঙ্গাস্নান সেরে ফিরে এসে তারপর থেকেই তাকে আর বাড়িতে দেখতে পাই না। কোথায় গেল? কোথায় গেল? কেউ বলতে পারে না। সারাদিনই আর বাড়িতে ফিরল না। কতো

রকম খোঁজ খবর করেছি—কতো দিন ধরে। তার আর সন্ধান পাওয়া যায়নি।—বুঝতেই পারছ ভাই, আমার মনের দুঃখটা। বড় আদরের ছেলে ছিল সে আমার। সারা জীবন মনে একটা গভীর ক্ষত রয়ে গেছে—আমার অনুতাপ হয় আমার অমন অন্যায় শাসনের ফলেই সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। তুমি কখনো এই চেহারার কাউকে কোথাও দেখেছ?—দেখ না তার ছবিটা ভাল করে।

আমি এতক্ষণ মনে মনে হিসাব করছি, তাঁর সে ছেলেটি দেখছি প্রায় আমারই সমবয়সী। ঘটনাটি ঘটেছে বছর পঁয়ত্রিশ আগে। তখন তার বয়স বছর ষোল। এ ছবি তারও কিছুকাল আগে তোলা নিশ্চয়। একটি সুশ্রী বালকের ছবি—তাও শুধু মুখটুকু নয়, দাঁড়িয়ে তোলা। এতোকাল পরে এই ছবি দেখে এখন কি আর কাউকে মিলিয়ে চেনা সম্ভব!

বুদ্ধিমান বিচক্ষণ একজন হাকিম তিনি, কিন্তু অনুতপ্ত পুত্র-শোকাতুর পিতার মন সেই বিচারশক্তি হারিয়েছে।

তাঁকে এ-সব কথা বোঝানোর চেষ্টা বৃথা। তাই শুধু বলি, আমি যা সামান্য ঘুরেছি, তার মধ্যে এ-চেহারার কাউকে দেখেছি বলে মনে হয় না।

তিনি বলেন, ছবিটা ভাই তোমার কাছেই এখন থাক। তুমি আবার বেরুচ্ছ তো? সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই একটু মিলিয়ে দেখো।

ছবিটা রাখা নিরর্থক জানলেও তিনি হয়ত এতে মনে কিছুটা শান্তি পাবেন ভেবে আমার কাছেই সেটা রেখে দিই।

বছর দুই পরে। আমি তখন আবার কলকাতায়। তিনিও একদিন এসেছেন আমাদের বাড়িতে। আমাকে দেখে খুশি হন। বলেন, কী ভাই? কোন সন্ধান পেলে নাকি? আমি কিন্তু কিছুদিন আগে একটা খবর পেয়েছি খুবই অপ্রত্যাশিত ভাবে। ডাকযোগে আমার নামে আসা একটা চিঠিতে। এই দেখ—

খামে ভরা একটা চিঠি আমাকে দেন। দেখি, শৈলেনবাবুর নাম ঠিকানা টাইপ করা খাম। ডাকটিকিটে G.P.O-র সীলমোহর। ভেতরের চিঠিও ইংরেজিতে টাইপ করা। বেনামী পত্র। পত্রপ্রেরক তাঁকে জানাচ্ছেন, হিমালয়বাসী উচ্চকোটি এক মহাত্মার নির্দেশে এই চিঠি লেখা। তিনি শৈলেনবাবুকে জানাতে বলেছেন, তাঁর নিরুদ্দেশ

পুত্র সেই মহাত্মার কাছে দীক্ষা নিয়ে কঠোর সাধনারত এবং তাঁরই নিকট রয়েছে। কিন্তু তার পিতার ব্যাকুলতার কারণে তার তপোসিদ্ধির উন্নতির পথে বিঘ্ন দেখা দিচ্ছে ; তিনি যেন পুত্রের হিতার্থে মনে কোন দুশ্চিন্তা পোষণ না করেন। পুত্র তাঁর সুস্থ আছে। পুত্রের কল্যাণে তিনি যেন পুত্রের সন্ধানের চেষ্টা থেকে বিরত থাকেন।

শৈলেনবাবু বলেন, ভাই, আমার বিশ্বাস, কলকাতার কেউ হিমালয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে সেই মহাত্মার দর্শন পান্ এবং ফিরে এসে চিঠিটা আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি নিজের নাম ঠিকানা জানাননি, পাছে আমি তাঁকে ছেলে কোথায় কোন্ সাধুর কাছে রয়েছে জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করি। তাই নয় কী ?

আমি বলি, নিশ্চয় তাই হবে। কিন্তু মনে মনে সন্দেহ করি, শৈলেনবাবুর কোন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু এখানে বসেই পত্রটি রচনা করে পাঠিয়েছেন।

তবে, এতে যে কিছুটা অন্তত তিনি মনে সান্ত্বনা পেয়েছেন, তা দেখি।

আমিও তাঁকে ফটোটি ফেরত দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হই।

কিন্তু, এতেও কী অনুতপ্ত পিতার মন থেকে অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষার জ্বালা সম্পূর্ণ নিভেছিল ? এ-সন্দেহের কারণ বলি।

কিছুকাল পরে আবার শৈলেনবাবুর সঙ্গে দেখা। বলেন, ভাই, চলে যাবার আগে দেখা করতে এলাম।

হেসে জিজ্ঞাসা করি, কোথায় চললেন ?

তিনি জানান, এখানকার সংসারের সব ব্যবস্থা করে দিয়ে চলেছি হিমালয়ে উত্তরকাশীতে, সেখানে বাণপ্রস্থী হয়ে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটাব।

বলি, সিদ্ধান্তটি মহৎ। কিন্তু, আপনার যে-স্নেহময় নরম মন, সব ছেড়েছুড়ে ওখানে থাকতে পারবেন ?

তিনি দৃঢ় কণ্ঠেই জানান, দেখো, ঠিক পারব।

ভাবি, এও কী তাঁর ছেলের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে নিজের মনের অনুশোচনারই প্রতিক্রিয়া ? অথবা, এখনও ছেলের সাক্ষাৎ পাওয়ার প্রত্যাশা ?

এরও বছর দেড় দুই পরে হঠাৎ একদিন শৈলেনবাবু এসে হাজির।

দেখে খুশি হই। জিজ্ঞাসা করি, উত্তরকাশী থেকে কবে এলেন? আবার ফিরবেন নাকি সেখানে?

তিনি ম্লান মুখে জানান, না, ভাই। ওখানে স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না, মনও ঠিক বসছিল না, জায়গাটাও ক্রমে বড় শহর গোছের হয়ে এসেছে,—শান্তি পেলাম না।

মনে মনে হাসি। ভাবি, মনে শান্তিলাভের ক্ষমতাও অর্জন করতে হয়। সে শক্তি না পেলে শান্তি কী কোথাও পাওয়া সম্ভব! কে জানে, হয়ত হিমালয়ে হারানো ছেলের অনুসন্ধানে বিফল হয়ে তাঁর ফিরে আসা।

এর কিছুকাল পরে কলকাতাতেই শৈলেনবাবুর পরলোকগমনের সংবাদ পাই। এতোকাল পরে তাঁর অনুসন্ধানের সমাপ্তিও ঘটে; হয়ত, কী জানি, নিরুদ্দেশ পুত্রের সঙ্গে একদিন মিলিতও হন্।

॥ দুই ॥

১৯৩৮ সাল। দিন কয়েকের জন্যে কলকাতায় এসেছি। ক'দিন পরেই ফিরে যাব হিমালয়ে। আসামের তেজপুর শহর থেকে অপরিচিত এক ভদ্রলোকের একটা চিঠি পেলাম। টাইপ করা। ইংরেজিতে লেখা। তাড়াতাড়ি উত্তর পাবার আশায় তাঁর নাম-ঠিকানা-লেখা টিকিটমারা একটা খামও পাঠিয়েছেন। চিঠিখানির মর্মার্থ এই ঃ

"এক ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনাকে বিরক্ত করছি এবং আশা রাখি এ সম্পর্কে উত্তরও পাব। আপনার 'হিমালয়ের পথে পথে' বইখানি আমি পড়েছি। তাতে এক বৈরাগীজির কথা লিখেছেন এবং তিনি অসমীয়া বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সম্বন্ধেই আমার কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা। বই-এ তাঁর যে ফটোটি আছে, সেটি সুস্পষ্ট না হলেও ভাল করে দেখেছি। আপনাকে জানাই, আমার চতুর্থ ভাইটি ১৯৩৮ সালের ১২ই মার্চ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগে আমাদের বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে যায়। তারপর থেকে উত্তরভারতের প্রায় সকল জায়গায় বহু অনুসন্ধান করেও তার কোন সন্ধান মেলেনি। তার কাছ থেকেও কোন খবরও পাওয়া যায়নি। শুধু এইটুকু খবর আমি সংগ্রহ করতে পারি যে সেই ১২ই মার্চ তারিখে রাত্রে তেজপুর থেকে

নিমাতিঘাট পর্যন্ত তখনকার যে যাত্রীবাহী স্টীমার চলত, তাইতে সে উত্তর আসামে রওনা দেয় এবং জোরহাটের নিকট নাগরিটিং ঘাটে নেমে যায়। এইটুকু ছাড়া আর কোন খবর সংগ্রহ করতে পারিনি। এখন আপনার বই-এ তার বর্ণনা ও ফটোখানি আমাদের পরিবারবর্গের সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং আমরা সবাই এ-সম্পর্কে আরও খবর জানতে খুবই উৎসুক।

তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, দয়া করে আমাদের জানান, সেই বৈরাগীজির সঙ্গে কবে আপনার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ও কোথায়ই বা শেষ দেখা হয় এবং সে জায়গায় কোথা দিয়ে কীভাবে যেতে হয়। এ ছাড়া আরও কিছু জানা থাকলে, তা লিখে জানালে আমরা আনন্দিত হব। এভাবে আপনাকে বিরক্ত করায় ক্ষমাপ্রার্থনা করি এবং চিঠির উত্তর পাব আশা রাখি।"

চিঠিখানি পড়ে এবং বৈরাগীজি সম্বন্ধে আমারও যা জানা ছিল, তাতে সন্দেহ থাকে না যে তিনিই পত্রলেখকের সেই নিরুদ্দেশ ভাই। কিন্তু, তখনি আবার ভাবি, বৈরাগীজি তো ইচ্ছা করলেই তাঁর ভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, তাঁর খবরাখবরও জানাতে সক্ষম, তবুও তিনি তা করেন না, এখন আমি তাঁর সন্ধান জানি বলে, তাঁর অজ্ঞাতে, তাঁকে আবার সংসারের জালে জড়িয়ে দেওয়া আমার উচিত নয়। তবে, এক সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের পরিচয় প্রচার করাও আমার ঠিক হয়নি,—লেখার সময় ভাবতেই পারি নি, কোথায় সেই আসামে তাঁর পরিবারবর্গের চোখে এটা পড়তে পারে। কিন্তু এখন কি করা উচিত? মনে মনে একটা প্ল্যান ঠিক করি। বৈরাগীজির ভাইকে আপাতত পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করে উত্তরে শুধু জানাই, আমি আবার হিমালয়ে চলেছি, ফিরে এসে উত্তর দেব।

মাস দুই পরে হিমালয় যাত্রা থেকে ফিরে কাশীতে গিয়ে থাকি। ভাবি, এবার সেই চিঠির একটা উত্তর দেওয়া উচিত। চিঠিটা লিখতে বসব, এমনি সময়ে বৈরাগীজির ভাই-এর আবার একটা চিঠি আসে। লেখেন, আবার আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা করবেন। আপনার পোস্ট কার্ড যথাসময়ে পেয়েছিলাম। তাতে জানিয়েছিলেন, হিমালয়ে আবার যাচ্ছেন, ফিরে এসে আমার চিঠির উত্তর দেবেন। আমাদের পরিবারের সকলেই এ-বিষয়ে বিস্তারিত খবর জানবার আশায় উদ্গ্রীব

হয়ে রয়েছি।

আমার এই উত্তরও তখনি লিখে পাঠাই ঃ

"আপনাকে চিঠি লিখতে বসছি এমন সময় আপনার দ্বিতীয় পত্রখানি কলকাতা ঘুরে এখানে এল কিছুদিন হোল হিমালয় থেকে ফিরেছি এবং সম্প্রতি কয়েকদিনের জন্য কাশীতে আছি। এবার হিমালয় যাত্রাকালে আপনার পত্রখানি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। আশা ছিল হয়ত বৈরাগীজির সঙ্গে পথে আবার কোথাও সাক্ষাৎ হবে এবং তখন আপনার পত্র-সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করব ও ফলাফল আপনাকে জানাব। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা এবার হয়নি। বদরীনাথের পথে যোশীমঠ প্রসিদ্ধ স্থান। সেইখানে বৈরাগীজির গুরুদেবের আশ্রম ছিল। কয়েকবছর হোল গুরুদেবের দেহাবসান হয়েছে। আমার বই-এ সে-কথার উল্লেখ আছে। বৈরাগীজির যোশীমঠে কিছুকাল থাকার কথা ছিল জানতাম। তাই এবার সেখানে পেঁছে খবরও নিই। অপর এক সাধুর সঙ্গে সেই আশ্রম-গুহায় দেখা হয়। তাঁর কাছে জানলাম, বৈরাগীজি ওখানে কিছুকাল কাটিয়ে কয়েক মাস আগে অন্যত্র চলে গেছেন। কোথায়,—তা' তিনি জানেন না। উত্তরাখণ্ডে—গাড়োয়ালেই —কোন নিভৃত স্থানে এখন আছেন বলে তাঁর অনুমান। বৈরাগীজির সম্বন্ধে আমার বই-এ যা' লিখেছি, তার বেশী কিছু জানাবার নেই। বদরীনাথের কাছেও যোশীমঠে তিনি কয়েক বছরই কাটিয়েছেন এবং বদরীনাথে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, সে-কথাও বই-এ উল্লেখ আছে। কয়েক বছর থেকে তিনি আর বদরীনাথে থাকেন না। আমার বই-এ তাঁর নাম জানাইনি। তিমি ঐ-অঞ্চলে মোহনদাস বৈরাগী এবং এখন মোহনদাস ত্যাগীজি নামে পরিচিত। যতদূর স্মরণ হয়, সমর গুহ-র 'উত্তরাপথ' বইখানিতেও এঁর কথা উল্লেখ আছে। এর বেশী আর কিছু জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে, একটা কথা লিখে এ-চিঠি শেষ করি। বৈরাগীজি নিজের আদর্শ অনুযায়ী গভীর ও নিভৃত সাধনায় মগ্ন আছেন। সাংসারিক কোন বিষয়ে তাঁর আকর্ষণ দেখিনি। দেহ তাঁর সুস্থ আছে, মনের প্রফুল্লতাও প্রকাশ পায়। তিনি যে-আনন্দলোকে বিচরণ করছেন তাঁর সেই সন্ন্যাস-জীবনের বিঘ্নকর কোন কার্য করা সমীচীন কিনা বিশেষ বিবেচ্য। আমার সম্ভাষণ জানবেন।"

এর পর অবশ্য সেই পত্রলেখকের আর কোন চিঠি পাইনি। ইতিমধ্যে কয়েকবার হিমালয়ে গেলেও বৈরাগীজির সঙ্গে আমারও আর দেখা হয়নি। তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগও আর নেই। তবে, তাঁর খবর আমার পাহাড়ী বন্ধুদের কাছে কখন-সখন হঠাৎ পেয়ে যাই। যদি ভবিষ্যতে দুজনের আবার দেখা হয়ে যায়, সেই নিরুদ্দেশ ভাইটির কথা অবশ্যই জানিয়ে চমকে দেব।

॥ তিন ॥

একদিকে সংসারে বিরাগী, গৃহত্যাগী, গুহাবাসী, উদাসী সন্ন্যাসী, অন্যদিকে নিরুদ্দেশ প্রিয়জনের সন্ধানে উন্মুখ সংসারী মানুষ,—মাঝে আমার যেন গোয়েন্দাগিরির কাজ। কখন সখন আমার মনও কৌতূহলী হয়,—যেন ধাঁধার উত্তর খুঁজে বার করা!

সেবার কলকাতায় কদিন কাটিয়ে আবার হিমালয় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এলেন দেখা করতে। আগে কখনও সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও নাম বলতেই চিনতে পারি। লোকমুখে ও কখনসখন পত্র-পত্রিকাতেও তাঁর নামের উল্লেখ পেয়েছি। শ্রীগুণদা মজুমদার। নিজের পরিচয় জানিয়ে তিনি বলেন, আপনার কাছে একটা খবরের আশায় এসেছি। আমার এক ভাই ভাল গান করতে পারত। তার নাম—অম্বিকা মজুমদার—

নামটি শোনামাত্রই আমি বলি, অম্বিকা মজুমদার! তার গান আমি শুনেছি বহুকাল আগে। সে তখন ছাত্র। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে ছাত্রদের যে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হোত, সেইখানে তার প্রথম গান শুনি। চমৎকার সুরেলা গলা, তেমনি সুমিষ্ট। অনেক প্রাইজ পেয়েছিল। তারপর রেডিওতেও তার গান হোত, দিলীপকুমার রায়ের প্রযোজিত গানের আসরেও গান গাইত। কিন্তু পরে আর কোথাও তার নাম শুনিনি, গানও নয়।

তিনি বলেন, ঠিকই বলছেন। শোনেননি তার কারণ বলি। সে তারপর একটা সুযোগ পেয়ে জার্মানী চলে যায়। সেখানে ইউরোপীয় সঙ্গীত শিখে ডক্টরেট ডিগ্রীও পায়। এরপরেই বেধে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সে তখনও বার্লিনে। তবুও তার চিঠিপত্র আমরা

পেতাম ;—মাঝে মাঝে ফ্রান্সের মধ্যে দিয়ে কীভাবে পাঠাত। এরই কিছুকাল পরে ব্রিটিশ বোমারু বার্লিনের উপর বোমা ফেলে। বার্লিন শহর ধ্বংস হয়। বহু নিরীহ লোক প্রাণ হারায়। সেখানে ভারতীয় মৃতব্যক্তিদের যে তালিকা দিল্লীতে গভর্নমেণ্ট প্রকাশ করে—তাতে দেখা গেল অম্বিকার নামও!

অবাক হয়ে শুনি অম্বিকার দাদার মুখে এই করুণ কাহিনী। ভাবি, অসাধারণ প্রতিভাবান এক তরুণ গায়কের এ কী মর্মন্তুদ জীবনাবসান।

তিনি বলতে থাকেন, অম্বিকার এইভাবে মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমরা সবাই স্বভাবতই গভীর শোকাভূত হই। কিন্তু, সে কথা শোনাতে আমার আসা নয়। পরে এমনি এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে যাতে এখন আমাদের মনে স্থির বিশ্বাস, তার মৃত্যুসংবাদটি ঠিক নয়। অম্বিকা আজও বেঁচে আছে। ঘটনাটি আপনাকে বলি। কিছুকাল আগে কলকাতায় আমার এক বন্ধু যাচ্ছিলেন এক ভৃগু জ্যোতিষীর কাছে, আমাকেও সেখানে টেনে নিয়ে গেলেন। তাঁদের কথাবার্তা শেষ হলে বন্ধুটি আমাকে বললেন, আপনিও কিছু জানতে চান ত প্রশ্ন করুন না। তখন হঠাৎ আমার মনে পড়ে অম্বিকার কথা। সত্যি বলতে কী, অম্বিকার মৃত্যুসংবাদটা মেনে নিলেও, মনে একটা ক্ষীণ আশা জেগে থাকেই, ঐ ভাবে মৃত্যু! হয়ত খবরটা ভুলও হতে পারে?—তাই সংবাদটা যাচিয়ে নেবার, আর সেইসঙ্গে ভৃগুর গণনার সত্যাসত্য পরীক্ষা করারও মনোভাব নিয়ে, অম্বিকার সম্বন্ধে জানতে চাইলাম। জ্যোতিষী তার জন্মতারিখ ইত্যাদি জেনে নিয়ে পুঁথি খুলে বললেন, আমি তার সমসাময়িক জাতকের এক এক করে কোষ্ঠী পড়ে যাচ্ছি, যেটাতে তার জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে মিলতে থাকবে বলবেন। প্রকৃতই, এক সময়ে অম্বিকার জীবনের কিছু কিছু ঘটনা মিলতে শুরু হোল এবং সত্যিই অবাক হয়ে যাই যখন শুনি, জাতক আকাশ থেকে অগ্নিবর্ষণে গুরুতর আহত হবে। আহত! 'হত' বা 'মৃত' নয়! তবে কী! উৎকণ্ঠিত হয়ে শুনতে থাকি। জ্যোতিষী পড়তে থাকেন, এক শ্বেতাঙ্গ সন্ন্যাসীর সেবাশুশ্রূষায় জাতক সুস্থ হয়ে উঠবে এবং পরে সন্ন্যাস নিয়ে হিমালয়ে চলে আসবে।

অম্বিকার কোষ্ঠীবিচারের এই সুখবরের পরে আমাদের চেষ্টা শুরু

হোল, হিমালয়ের কোথায় তার সন্ধান পাওয়া যায়। এমনি সময়ে আর এক যোগাযোগ। এই কদিন আগে। হঠাৎ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। তাঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে জানতে পারি, কয়েক বছর আগে তিনি গঙ্গোত্রী-গোমুখ অঞ্চলে যান। সেখানে এক সাধুর দর্শন লাভ করেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় প্রকাশ পায়, তাঁর বাঙলার শরীর এবং তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ও শুধু এ দেশীয়ই নয়, পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত সম্পর্কেও তাঁর গভীর জ্ঞান। ভদ্রলোক কৌতূহলী হয়ে সাধুকে প্রশ্নও করেছিলেন, ইউরোপীয় সঙ্গীতকলাতেও তাঁর এমন জ্ঞান লাভ হোল কী করে? গিয়েছিলেন সেখানে? সাধুজি তাতে উত্তর দেন, সাধুসন্ন্যাসীর পূর্ব-পরিচয় সম্পর্কে জানতে নেই, কে কী ছিল, মজুমদার না কী? এ জেনে লাভও নেই।—বুঝতেই পারছেন, ভদ্রলোকের মুখে এই বিবরণ শুনে—বিশেষ করে ঐ 'মজুমদার' কথাটির উল্লেখে আমাদের আশা জেগেছে, ইনিই আমাদের অম্বিকা। কিন্তু, সে ভদ্রলোক ত গিয়েছিলেন কয়েক বছর আগে। সে সাধু কী এখনও ঐ অঞ্চলেই রয়েছেন? আপনি তো প্রায়ই ওদিকে যান—হয়ত বলতে পারবেন। তাই আপনার কাছে আসা।

আমি তাঁকে জানাই, সঙ্গীতজ্ঞ যে দুতিনটি সাধুর দর্শন আমি পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে কেউ অম্বিকা নয়। সবাই অবাঙালী। তবে এবারও ও-অঞ্চলে যাব, তখন ভাল করে খোঁজখবর নেব।

কিন্তু, তাঁকে জানাবার মত কোন খবর পাই না। ফিরে এসে তাঁকে সে কথা বলি। তিনি তাতে নিরাশ হন। তবে জানতে পারি, অন্যান্য হিমালয় যাত্রী, এমনকি পর্বত-অভিযাত্রী কারও কারও সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রেখেছেন এবং অনুসন্ধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

তারপরও দশ পনেরো বছর কেটে গেছে। অম্বিকার দাদার সঙ্গে আমার আর দেখাও হয়নি। কিন্তু, ঘটনাটি সম্পর্কে আমারও কৌতুহল যে মন থেকে মুছে যায়নি তার প্রমাণ পেলাম এই কদিন আগে।

বম্বেতে কিছুদিন কাটাচ্ছি। প্রতিবেশী এক গুজরাটী বন্ধুর সঙ্গে প্রায় রোজই দেখাসাক্ষাৎ ও গল্প হয়। মাঝে কদিন আর তাঁকে দেখি না। খোঁজ নিয়ে জানি, বম্বের বাইরে গেছেন। কদিন পরে ফিরে এলে আবার দেখা হয়। জিজ্ঞাসা করি, কোথায় কদিন ঘুরে এলেন?

তিনি জানান, গিয়েছিলাম বরোদায়। ঠিক সেখানে নয়,—

বরোদা থেকে কয়েক মাইল দূরে—এক সাধুর আশ্রমে। সাধুটিকে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধাভক্তি করি। মানুষটিও চমৎকার। উচ্চ-শিক্ষিতও। মাঝে মাঝেই ওখানে যাই। দুচারদিন কাটিয়ে আসি। মনে বেশ শান্তি পাই। আর সেখানে গেলে উচ্চাঙ্গের গানবাজনাও শোনা যায়।

সাধুজির সম্বন্ধে আমারও তখন কৌতূহল জাগে। প্রশ্ন করে জানতে পারি, বন্ধু সাধুজিকে গান গাইতে শোনেননি বটে ; কিন্তু দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বড় বড় গাইয়ে-বাজিয়েদের তিনি আমন্ত্রণ করে আনান এবং আশ্রমে নিয়মিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিরাট আসর ও জলসা বসে।

জিজ্ঞাসা করি, সাধুজির শরীর কোথাকার জানেন নাকি ?

বন্ধু বলেন, বাঙলার। এবার একদিন তাঁকে আপনার কথা বল-ছিলাম। আপনার পরিচয় শুনে তিনি তখনি আপনার বাবার কথা উল্লেখ করলেন—গভীর শ্রদ্ধাভরে। সে-সময়কার আরও দুএকজন নাম করা বাঙালীর কথাও বললেন, তাঁদের কারও কারও সঙ্গে যোগাযোগও ছিল বোঝা গেল। কিন্তু এ'র সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেন ?

বন্ধুকে তখন অম্বিকার কথা বলি। এবং ঠিক হয়, বন্ধু আবার যখন তাঁর আশ্রমে যাবেন, আমিও সঙ্গী হব। কিন্তু তাঁর অল্প কদিন পরেই আমি বম্বে থেকে চলে আসি। তবে সুবিধা পেলে এ-কৌতূহল মেটাবার ইচ্ছা এখনো রাখি।
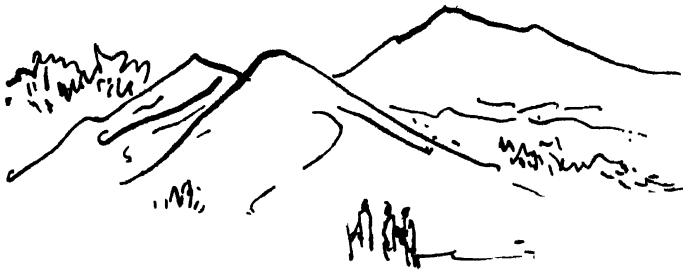
কি কথা ছিল যে মনে

কোন্ সে কথা ? কারই বা মনে ? সেই কাহিনীই শুনাই। তবে, প্রকৃত নাম গোপন রেখে।

বছর দশ পনেরো আগে। পাহাড় থেকে নেমে ক'দিনের জন্যে কলকাতায় এসেছি। বেলা প্রায় এগারোটা। বড়দা স্নানাহার করতে বাইরের বসবার ঘর থেকে উঠে ভেতরে গেছেন। আমি স্নান সেরে তাঁর পাশের ঘরে একা বসে। ঘরের সুমুখে রোয়াক। দেখি, এক বৃদ্ধ গোছের ভদ্রলোক রোয়াকে ওঠার তিন-চারটি মাত্র ধাপ উঠতে যেন ক্লান্তিতে হাঁফিয়ে পড়েন। চেহারা যেন রুগ্ন শীর্ণ। রোয়াকে উঠে ঘরের দরজার নিকটে আমাকে বসে থাকতে দেখে সেই দিকে কম্পিত পদে এগিয়ে আসেন। ভাবি, বড়দার সঙ্গে বৃদ্ধটি দেখা করতে এসেছেন, হয়ত কোন সাহায্যের প্রার্থনায়। আমি উঠে দাঁড়িয়ে দরজার বাইরে আসি, জানাতে যাই, বড়দা তো ভেতরে গেলেন, আবার বাইরে আসতে দেরী হবে। দেখি, তিনিও আমার দিকে এগিয়ে এসে কাঁপা গলায় বলেন, আমাকে একটু জল দেবেন ?

আমি বলি, বসুন আপনি চেয়ারে, জল আনছি।

তখনি ভেতরে গিয়ে এক গ্লাস জল এনে তাঁর হাতে দিই। তিনিও তখনি যেন বহুক্ষণের তৃষ্ণা মিটাতে এক ঢোকে জলটা খেয়ে, হাঁফ ছেড়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। শূন্য গ্লাসটা তাঁর হাত থেকে নিই। ভাবি, বয়সের ভারে ও দুর্বল শরীরে রোদে হেঁটে এসে এমন অপরিসীম ক্লান্তি। তাই তাঁকে বলি, দেখুন তো এই দুপুরের রোদ্দুরে এমনভাবে আপনার আসাটা ঠিক হয়নি। একটু স্থির হয়ে বিশ্রাম করুন—

কথাগুলি আমার শেষ হয়নি, তিনি করুণ চক্ষে আমার মুখের পানে তাকান। কাঁপা গলায় বলেন, আমি যে আপনার কাছেই এসেছি, বিজুদা!—

আমার ডাকনাম শুনে চমকে উঠি—কে এ? এ যে বহুকাল আগে শোনা পরিচিত কণ্ঠ।—একদৃষ্টে তার পানে তাকিয়ে দেখি—আমার মুখ দিয়ে অস্ফুট ফুটে ওঠে তার নাম—হেমাঙ্গ!

সে-ও আমার দিকে তাকিয়ে তেমনি কাঁপা গলায় বলে,—হাঁ বিজুদা, আমিই!

আমি তার পাশের চেয়ারে বসি। মনের ভিতর তখন আমার বিস্ময়, আবেগ, আরও কতো বিচিত্র ভাবের আলোড়ন চলে,—স্মৃতি-সাগর মন্থনে ভেসে ওঠে ভুলে থাকা কতো কী সেকালের ঘটনাবলী!

মনকে শান্ত করাই। মুখে মৃদু হাসি ফোটাই। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলি, হেমাঙ্গ! কেমন আছ তুমি?

সেও এতক্ষণে কিছুটা ধাতস্থ হয়ে জানায়, শরীরটা তেমন ভাল নেই। বয়সও তো হয়ে গেল।

বলি, অনেক বছর আগে জানতাম, তুমি বাংলার বাইরে অমুক অঞ্চলে কোথাও ছিলে। এখন এখানেই রয়েছ?

সে বলে, হাঁ, ঐসব অঞ্চলেই আমার চাকরি করে কেটেছে। রিটায়ার করার পর চলে এসেছি এখানে।

এইভাবেই পরস্পর কথাবার্তা চলে। সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ সহজভাবেই যে ঠিক তা নয়। মনে আমার পুঞ্জীভূত কৌতূহল, বহু প্রশ্ন জাগে। তবুও বিগতদিনের কোন কিছুরই সম্পর্কে প্রশ্ন করি না, এমন কি এখন এখানে কোথায় রয়েছে তাও জানতে চাই না। চেষ্টা করি কথাবার্তা বলতে যেন তার সঙ্গে আমার যেমন আগে আলাপ পরিচয় ছিল—এখনও তেমনি,—মাঝে কোন কিছুই ঘটেনি।

অথচ, ঘটেনি তাতো নয়। ঘটেছিল অনেক কিছুই। যেন, আগুন-লাগা কাণ্ড। আর তারই ইন্ধন জোগাতে হেমাঙ্গরও কিছুটা ছিল সহযোগ। কতোখানি তা আজও জানি না। জানতে আগ্রহ বহুকাল থেকেই। কিন্তু, প্রশ্ন করতে মুখে বাধে।

এবার সেই চাঞ্চল্যকর ঘটনার সামান্য অংশ বলি। কিন্তু, তার আগে হেমাঙ্গর সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথা শোনাই।

ষাট বছর আগেকার ঘটনা।

সেই আমার প্রথম কেদারবদরী যাত্রা। মাকে নিয়ে। তখন হৃষীকেশ থেকে যেতে হোত্ পায়ে হাঁটা পথ ধরে। সেই যাত্রাপথে এক চটিতে হেমাঙ্গর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়। হিমালয়ের সেকালের দুর্গম তীর্থপথের সঙ্গী। তাই, সে পরিচয়ের স্বরূপই আলাদা। আমার এক রচনায় সেবারের সেই যাত্রার সামান্য বর্ণনার মাঝে হেমাঙ্গরও উল্লেখ আছে এই ভাষায়।

"পথের এক চটিতে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে যাত্রী। মা বলেন, দেখ না কি হল বেচারীর। হয়তো অসুখবিসুখ।

ঠিক তাই। এক বাঙালী যুবক। একাই পথে বেরিয়েছে। নিজের সামান্য জামা-কম্বল নিজেই বয়। কলকাতার কলেজের ছাত্র। লম্বা চেহারা। স্বাস্থ্য ভালই; কিন্তু অনাহারে অনিয়মে পথশ্রমে কদিনেই স্বাস্থ্য ভাঙে, জ্বরেও পড়ে।

মা বলেন, যেতে চায় তো সঙ্গেই চলুক না কেন? একই সঙ্গে সবাই খাওয়াদাওয়া করবে। দলে একজন সঙ্গী না হয় বাড়লই। বেচারী! এভাবে ছেলেমানুষ একা বেরোয় কখনো এ-পথে?

ছেলেমানুষ,- তবু কথা বলেন না, একসঙ্গে চললেও, থাকলেও। এতই ছিল সেকালের মায়েদের লজ্জাসরম। ছেলেটি ভাল। কথাবার্তায়, আচারে ব্যবহারে। আদর্শবাদী মন। আবার স্পোর্টম্যানও। এমন সঙ্গী পেয়ে আনন্দই পাই। সারা তীর্থপথ একসঙ্গে কাটাই।"

তারপর, সেই হিমালয়যাত্রা থেকে কলকাতায় ফিরে এসেও আমাদের সংযোগ থাকে। হেমাঙ্গ মাঝে মাঝেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। কতো গল্প হয়। ছোটভাই-এর মত তাকে স্নেহের চক্ষেও দেখি।

এর বছর তিনচার পর সেই চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

কলকাতায় বিপ্লবীর গুলিতে এক ইংরেজ প্রাণ হারান। পুলিশের ধরপাকড় চলে। দলের কয়েকজন গ্রেপ্তারও হন। তার মধ্যে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুও দু'একজন ধরা পড়ে। আমার সঙ্গে এই বিপ্লবীদলের কিছুটা সংযোগ ছিল। হেমাঙ্গও যে তার মধ্যে আছে, জানতাম। কিন্তু, তার সঙ্গে এ-সম্পর্কে কোন আলাপ আলোচনা আমার হয়নি। সে আমার সম্পর্কে কী জানত, জানি না।

কিছুদিন পরে খবর পাই, পুলিশ হেমাঙ্গকে গ্রেপ্তার করেছে।

সেই হত্যাকাণ্ডের ও রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত আসামীদের বিচার আদালতে শুরু হয়।

একদিন শোনা যায়, হেমাঙ্গ রাজসাক্ষী!

তার সেই সাক্ষ্যে ও স্বীকারোক্তির মধ্যে সে আমার নামও নাকি উল্লেখ করে।

বিচারে অভিযুক্তদের মধ্যে আমার বন্ধুর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

আর, হেমাঙ্গ গভর্নমেন্টের আনুকূল্যে সেই সুদূরে চলে যায়,—আমার ধারণা, সেই অঞ্চলে সে ভিন্ন নাম ও পরিচয়ে ব্রিটিশ সরকারেরই সাহায্যে পরবর্তী জীবন কাটায়।

সেই হেমাঙ্গর সঙ্গে আজ এতকাল পরে আমার দেখা! আর, হেমাঙ্গ নিজেই এসেছে দেখা করতে?—কেন?

মনে আমার সঞ্চিত বহুদিনের প্রশ্ন,—হেমাঙ্গ 'অ্যাপ্রুভার' হোল কেন? সে কী প্রথম থেকেই সরকারের গুপ্তচর ছিল? সেই হিমালয়ে যখন প্রথম পরিচয়—তখনও? সেই আমার চোখে দেখা আদর্শ তরুণ! অথবা, সেকালের পুলিশের সেই নিষ্ঠুরতম ও জঘন্য নির্যাতন সইতে না পেরেই তার রাজসাক্ষী হওয়া? কিন্তু, সেই বিদেশী সরকারের দয়াদাক্ষিণ্যের ভিক্ষান্নে পরবর্তী জীবন কাটানো!

আজও কেবলি সেই সব প্রশ্নই মনে বিপুল আলোড়ন তোলে। তবুও, তাকে জিজ্ঞাসা করতে মুখে বাধে। পারি না।

কিছুক্ষণ গতানুগতিক কথাবার্তার পর সে চেয়ার ছেড়ে ওঠে। গেট পর্যন্ত তার সঙ্গে গিয়ে এগিয়ে দিই। গেট দিয়ে বার হবার মুখে সে হঠাৎ দাঁড়ায়। মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকায়। সে-চোখের ভাষা বুঝতে পারি না। কম্পিত অস্ফুট কণ্ঠে বলে, বিজুদা, আমার সম্বন্ধে বই-এ অমন কথা লিখলেন কী বলে? আমার স্ত্রী ওটা পড়ে আমাকে বারবার বলছিল, আপনার কাছে আসতে,—আমিও চলে এলাম।

আমি বলি, বই-এ যে-কথা বলেছি সে তো সেই সময়ের। তখন তো—

সে বাধা দিয়ে বলেন, কিন্তু, বইটা লিখেছেন তো তার অনেক বছর পরে?—উঃ! কী করে লিখতে পারলেন ঐ কথা!

আমি তার হাত ধরে বলি, ইচ্ছে হয়, আবার এস।

অতি ধীর পদে সে চলে যায়।

কিন্তু, আর তারপর আসেনি।

মায়াডোর

হিমালয়ের গহন অভ্যন্তরে এক শান্ত আশ্রম। গগনচুম্বী চূড়ার কিছু নিচে, পাহাড়ের কোলে, নিবিড় বনে ঘেরা নির্জন নিভৃতে কয়জন সাধুর বাস।

আমি সেখানে কয়দিনের অতিথি। সঙ্গে তরুণ সঙ্গী অনাথবন্ধু। নভেম্বর মাস। শীতকাল শুরু। আশ্রম প্রায় ফাঁকা।

আমরা পৌঁছুতেই এক ব্রহ্মচারীজি আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসেন। স্বাগত জানান। আর, বাগানের কোথা থেকে ছুটে এসে হাজির হয় পাহাড়ী প্রকাণ্ড এক কুকুর,—গা-ভরা বড় বড় কালো লোম, বাঘের মত ভীষণ আকৃতি!

সন্ত্রস্ত হয়ে আমরা সরে দাঁড়াতে যাই। ব্রহ্মচারীজি হেসে আশ্বাস দেন, ভয় নেই, ভয় নেই,—ও কিছু করবে না। এ-ই ভোলা! চলে আয় আমার পাশে এদিকে।

কুকুরটিও একবার আমাদের চারপাশ ঘুরে—হয়ত আমাদের

গন্ধ শুঁকে, তখনি শান্তভাবে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আমাদের মুখপানে তাকায়। তখন দেখি, অমন ভীষণ আকার হলেও তার চোখের দৃষ্টিতে কোন হিংস্রতার আভাসমাত্র নেই। জ্বল্‌জ্বল্‌ করে তাকাতে থাকে। লক্‌লকে জিভ্‌ বার করে যেন হাঁফায়।

সেই আমাদের প্রথম দেখা ভোলাকে।

পরে জানতে পারি, ভোলা কয় বছর হল এই আশ্রমবাসী। কোন্‌ পাহাড়ী গ্রাম থেকে হঠাৎ এখানে আসে, এখানেই থেকে যায়। স্বামীজীরা তাকে পেয়ে প্রথমে খুশিই হন। ভাবেন, ভালই হল। চারদিকে যা গভীর বন,—এমন বাঘের মতন দেখতে কুকুর,—আশ্রমে পাহারা দিতে পারবে।

কিন্তু কালক্রমে দেখা যায়, ভোলা সেদিক থেকে কোন কাজেরই নয়। দেখতে ভীষণ হলেও সে তেমন গুরুগম্ভীর গর্জন করে ডাক ছাড়ে না, অচেনা কাউকে দেখলেও হুঙ্কার দিয়ে তাড়া করে না। অতি শান্ত নিরীহ। অমন কুকুর অযথা আশ্রমে রেখে লাভ কী! কয়বারই তাকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। বিতাড়িত হয়ে চলেও যায়। কিন্তু প্রতিবারই ক'দিন পরে আবার ফিরেও আসে। অগত্যা ভোলা আশ্রমেই আশ্রয় পায়। বাগানের মধ্যে, বনের আশেপাশে আপন মনে ঘোরে ফেরে, খেলা করে। মাঝে মাঝে কোথা থেকে আর একটা কুকুরও আসে, তার সঙ্গে তখন খুব স্ফূর্তিতে ছোটাছুটি খেলাধুলা চলে। সে-কুকুরটার গা-ভর্তি ঘোর কালো লোম,—তাই তার নাম হয়েছে কালু। কালু কিন্তু এখানে থাকে না,—আসে, যায়। ভোলাকে রাত্রে আশ্রমের ভিতর উঠানে বা বারান্দায় বেঁধে রাখতে হয়। হিমালয়ের এই গভীর অরণ্য অঞ্চলে রাত্রে বাইরে থাকলে নির্ঘাত বাঘে নিয়ে যাবে। কুকুর বাঘেদের প্রিয় খাদ্য।

আমরা যে কয়দিন আশ্রমে থাকি, আশপাশে, বনাঞ্চলে, পাহাড়ের শিখরদেশে, বহু নিচে ঘনবন-ঘেরা পাহাড়ী নদীর ধারে যখনই ব্রহ্মচারীজির সঙ্গে যে কোন জায়গায় ঘুরতে যাই, ভোলা আমাদের নিত্যসঙ্গী। শুধু সঙ্গে থাকাই নয়, সে আমাদের পথপ্রদর্শকও। জঙ্গলের মধ্যে পায়ে-হাঁটা কোন্‌ পথরেখাটি ঠিক পথ—ভোলা সামনে ছুটতে ছুটতে দেখিয়ে নিয়ে চলে। আমরা গল্প করতে করতে ভুল দিকে গেলে সে দাঁড়িয়ে যায়, তার দেখানো পথে ফিরে এসে আমরা

চলতে থাকলে আবার আনন্দে লেজ নাড়াতে নাড়াতে এগিয়ে চলে।

আশ্রমের বাগানে আমরা দুজন যখন চুপ করে বসে সুদূর দিগন্তে হিমালয়ের তুষার শিখরগুলির অপরূপ শোভা উপভোগ করি, ভোলাও কাছে এসে বসে থাকে স্থির হয়ে।

অনাথবন্ধু কবি। সে তাকে দেখিয়ে আমাকে বলে, দেখেছেন ভোলাকে। কি রকম জ্বল্‌জ্বল্‌ চোখে তাকিয়ে। মনে হচ্ছে যেন ক্লাসের সব চেয়ে পিছনের বেঞ্চেবসা, পড়াশুনায় উদাসীন এবং অত্যন্ত শান্ত নির্বিকার ছাত্রের মুখের মত যেন ওর মুখের ভাব,—সরলতার প্রতিমূর্তি!

ভোলা প্রকৃতই সেই প্রকৃতির।

যেদিন আমরা চলে আসি সেদিনও ভোলাকে ওইভাবেই বাগানে বসে থাকতে দেখি।

সেবারের হিমালয় যাত্রা থেকে ফিরে আসার পর মাস কয়েক কেটে গেছে। আবার ঘুরতে বার হয়েছি। সেই ভোলা কুকুরের কথা প্রায় ভুলেই গেছি। এমনি সময়ে এক জায়গায় হঠাৎ আশ্রমের সেই ব্রহ্মচারীজির সঙ্গে দেখা। আশ্রমের খবরাখবর নিই। বলি, কী চমৎকার শান্ত দিনগুলি কেটেছিল। আবার যাওয়ার সৌভাগ্য হলে আরও বেশিদিন থাকতে হবে। ভাল কথা, আমাদের সেই গাইড ভোলার খবর কী?

ব্রহ্মচারীজির মুখ বিষণ্ণ হয়। বলেন, ভোলা? সে আর নেই।

ভাবি, অমন শান্ত স্বভাব কুকুর, হয়ত শেষ পর্যন্ত কোন্‌ দিন বাঘেই নিয়ে গেছে!

কিন্তু, তারপর তাঁর কাছে যে কাহিনী শুনি সে যেন আরও করুণ!

আমরা চলে আসার পর আশ্রমের এক অতিথি একদিন সকালে তখনকার প্রচণ্ড শীতে মুড়িসুড়ি দিয়ে বারান্দা থেকে বাগানে নেমেছেন, ভোলা সেখানে বসে ছিল, দেখতে পাননি, গায়ে পা লেগে যায়—ভোলাও তাকে হঠাৎ দেখে চমকে উঠে তাঁর পায়ে কামড়ে দেয়। ভদ্রলোককে তারপর শহরে নেমে এসে ইন্‌জেক্‌শন নিতে হয়।

মাসখানেক পরে আবার এক দুর্ঘটনা। অপর এক বয়স্ক অতিথি লাঠি হাতে বাগানের মধ্যে যেখান দিয়ে আসছিলেন, ভোলা ও কালু সেইখানে ঝটাপটি করে খেলায় মত্ত। সেই খেলার মাঝে—হয়ত তাদের

খেলায় বাধা ঘটায় দুজনেই তাঁর পায়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে, আঁচড় বা কামড়ও দেয়। সেই ভদ্রলোককেও অবিলম্বে শহরে নেমে গিয়ে ইন্‌জেক্‌শন নিতে হয়।

পর পর এই দুই দুর্ঘটনার পর স্বামীজীদের আশঙ্কা জাগে, হয়ত কুকুর দুটো ক্ষেপে গেছে, তাদের আর বেঁচে থাকতে দেওয়া বিপজ্জনক।

তাই তাঁরা স্থির করেন, পাহাড়ের ওপর দিকে বনের ধারে ভোলাকে আর কালুকে নিচে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ভ্যালির ঘোর জঙ্গলে নদীর ধারে বেঁধে আসা হোক। দুজনকেই বাঘে খাবে।

সেই মত ব্যবস্থাও হয়।

সেদিন রাত্রে নিচে ভ্যালি থেকে কুকুরের মর্মভেদী আর্তনাদ শোনা যায়। পরদিন দিনের বেলা সেখানে গিয়ে দেখাও যায় বাঘে-খাওয়া কালুর দেহাংশ।

ওদিকে কিন্তু পাহাড়ের ওপর দিকে ভোলা অক্ষত দেহে চুপচাপ বসে। ব্রহ্মচারীজিকে দেখে বাঁধা অবস্থায় ছটফট করে লাফায়। সেই রকম জ্বল্‌জ্বল্‌ করে তাকায়। কিন্তু, স্বামীজীদের আদেশ ; তাকে ছাড়বার উপায় থাকে না। ব্রহ্মচারীজি ফিরে আসেন, গোপনে কিছু বিস্কুট ও খাবার নিয়ে তাকে খাইয়ে আসেন।

এইভাবে সেই বাঁধা অবস্থায় ভোলা ক'দিন কাটায়। তবুও, বাঘে তার কিছুই করে না।

ভোলার সেই ভীষণ চেহারা দেখে বাঘ কি ভয় পায়? অথবা, ভোলার সেই উদাসীন শান্ত চোখের দৃষ্টি বাঘেরও হিংসা ভোলায়?

ব্রহ্মচারীজি কিন্তু প্রতিদিন লুকিয়ে তাকে খাইয়ে আসতে থাকেন।

অবশেষে একদিন স্বামীজীরা অগত্যা সিদ্ধান্ত নেন, ভোলাকে সে রাত্রেও বাঘে না খেলে পরদিন গুলি করে তাকে মারা হবে।

সেইভাবে মারবার আগের দিন ব্রহ্মচারীজি তাকে খাইয়ে ফিরে আসতে যাবেন, ভোলা দু পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে অপর দু পা দিয়ে জড়িয়ে ধরে, ছাড়তে চায় না। মুখ তুলে সেই জ্বল্‌জ্বল্‌ চোখে যেন বলতে চায়, আমি এমন কী করেছি যার জন্যে আমার এমন শাস্তি? আর কখনও করব না আমি,—পায়ে ধরি—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও আমাকে!

ম্লান মুখে অসহায় ব্রহ্মচারীজি ফিরে আসেন। সজল চক্ষে স্বামীজীদের বহু অনুনয় করেন, ভোলাকে না মেরে ছেড়ে দেওয়া হোক। এখানে থাকতে দেওয়া না হয়, বাস-এ তুলে দূরে কোন গ্রাম বা শহর অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেই হয়। কেন বেচারীর এইভাবে প্রাণ নেওয়া !

স্বামীজীরা কোনমতেই রাজি হন না। নিরুত্তাপ অবিচলিত কণ্ঠে বলেন, তাই বা কি করে সম্ভব ? সেখানেও যদি কারও কোন ক্ষতি করে ? আর তা ছাড়া, তপস্যা করতে এসে সাধুদের এত মায়ার বশীভূত হওয়াও কখনই উচিত নয়। মনে নেই, জড় ভরতের এক পূর্বজন্মে হরিণের প্রতি আসক্তির ফলে অধোগতি ! সন্ন্যাসীদের সম্পূর্ণ অনাসক্ত থাকতে হবে।

অবশেষে পরদিন ভোলা বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারায়।

স্বামীজী আশ্রমের সেবকটিকে ডেকে আদেশ দেন, ওরে। কুকুর দুটোকে যে লোহার শেকলে বাঁধা হয়েছিল, খুলে নিয়ে এসে রেখে দে, —ফেলে দিস্ না—কবে কোন্ কাজে লাগে !

বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো

সেদিন বন্ধুবর চট্টরাজ নিজের সরকারী চাকরি জীবনের এই ঘটনাটি শোনালেন ঃ

"সে আমার এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। বেহারের এক বড় শহরে আমি তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ঐ সময়ে সেই অঞ্চলের বনে জঙ্গলে কজন সন্ত্রাসবাদী আত্মগোপন করে আছে। সরকার তাদের আচমকা ধরবার উদ্দেশ্যে আইন করেছে, গ্রেপ্তারি পরওয়ানা ছাড়াই তাদের গ্রেপ্তার করা যেতে পারে, কিন্তু পুলিশদলের সঙ্গে একজন ম্যাজিস্ট্রেট থাকা চাই খানাতল্লাসির সময়। আমার তাই সময়ে অসময়ে পুলিশের সঙ্গে ঐ কাজে বার হতে হয়। স্বভাবতই, এই ধরনের গ্রেপ্তারের আয়োজন চলে খুবই গোপনীয়তায়,—যাতে আসন্ন গ্রেপ্তারের কোন রকম খবর ফাঁস হয়ে দলটিকে সতর্ক করে না দেয়। গোপনীয়তা এমনি নিশ্ছিদ্র রাখার ব্যবস্থা যে সঙ্গে-নিয়ে-যাওয়া ম্যাজিস্ট্রেটকেও জানতে দেওয়া হয় না গন্তব্যস্থান কোথায়। জানে শুধু সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর দলপতি অফিসার। তাঁরই নির্দেশে গাড়ি চালানো হয়।

সেটা তখন শীতকাল। তার ওপর কদিন বর্ষাবাদল চলেছে। রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে লেপকম্বল চাপিয়ে আরামে ঘুমোবার চেষ্টায় রয়েছি —তলব এল আধঘণ্টার মধ্যেই বার হতে হবে। মনে যতই বিরক্তি জাগুক, তাড়াতাড়ি উঠে ধরাচুড়া পরে তখনি তৈরি হতেই হয়। পুলিশের জীপও এসে যায়। তাতে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। তাদের মিলিটারী অফিসার। তাঁরই নির্দেশে গাড়ি চলতে থাকে। টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। একে কনকনে শীত তায় এই বাদলা। গাড়ির ভেতর মুড়িশুড়ি দিয়ে বসলেও কাঁপুনি যায় না। শহর ছাড়িয়ে গাড়ি ছোটে। আরম্ভ হয় পাহাড়ী এলাকা। পথের দুধারে বনজঙ্গল। মনে হয়, মাইল তিনচার যাওয়ার পর, অফিসার জীপ থামিয়ে দলকে নামবার হুকুম দেন। ভাবি, যাক, বেশিদূর যেতে হল না, বৃষ্টিটাও

থেমেছে। অফিসার বনের মধ্যে হাঁটাপথ ধরেন—সবাই পিছু পিছু চলি। উঁচু নিচু পাহাড়ী জায়গা, মাঝে মাঝে ছোটখাট ঝরনা। মেঘলা রাতের জমাট অন্ধকার। কোনরকমে পথ চিনে চলা। কিন্তু বৃষ্টির দরুণ পথ পিছল, মাঝে মাঝে নিচু জায়গায় থলথলে কাদা। আমার এই নধর দেহটিকে নিয়ে চলাই দুষ্কর হয়ে ওঠে, প্রতিপদেই ভয় হয়, এই বুঝি পা পিছলে পড়ি। তার ওপর আর এক বিপত্তি দেখা দিল—আমার অভ্যাস প্যান্টের সঙ্গেও কাবুলি স্লিপার পরা,—এক পাটি চটি কাদার মধ্যে ঢুকে এমনি ভাবে হারাল তাকে আর উদ্ধার করা গেল না। খালি পায়ে চলতে শুরু করি। গাড়ি থেকে নেমে ভেবেছিলাম, গন্তব্যস্থানে বুঝি পৌঁছে গেছি, কিন্তু এ যে এখন দেখি থামবার নাম নেই,—চলেছি তো চলেছিই। অফিসারকে জিজ্ঞাসা করি, কতোক্ষণ এইভাবে যেতে হবে? হুঁশিয়ার অফিসার, গোপনতা এখনও শিথিল করা চলে না, বলেন, এখন চলুন তো, থামবার সময় হলেই জানতে পারবেন।

মুখে বলি, চল বাবা, যেখানে নিয়ে চলেছ, চল।

মনে মনে ভাবি, এ-যেন আমাকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলে কোন বন-জঙ্গলে অন্তরীণ করে রেখে আসতে।

আবার তখনি মনে হয়, এতো রাইফেল বন্দুকধারী পুলিশ, নিশ্চয় খুবই জাঁদরেল সন্ত্রাসবাদীকে ধরতে চলেছে। তিনিও কি আর অমনিতেই ধরা দেবেন? এই অন্ধকারে বনের মধ্যে খন্ডযুদ্ধই হয়ত বাঁধবে! প্রাণটা বাঁচিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারলে হয়।

সেই পিছল পথে খালি প্যায়ে আমার চলার দুর্গতি দেখে এক সান্ত্রী এগিয়ে এসে সহানুভূতি দেখিয়ে বলে, ক্যা সাহাব! আপকা তকলিফ হো রহে?

আমি উত্তরে জানাই, নেহি ভাই! বহুৎ আনন্দমে যা রহে।

যাই হোক, কোন রকমে এগিয়ে চলেছি। পথ যেন শেষই হয় না। ঐ ভাবে বনজঙ্গল মাঠ পেরিয়ে এসে অবশেষে এক চওড়া নদীর ধারে এসে পেঁছান হয়। সাধারণত, এ সব নদীর বালুময় বুকে ক্ষীণ ধারা বয়, কিন্তু, কদিন বৃষ্টির ফলে এখন জলস্রোত। হেঁটে সেই নদী পার হওয়া। ভাবি পায়ে তো জুতো নেই, প্যান্ট হাঁটুর ওপর গুটিয়ে ধীরে ধীরে জলধারা পার হয়ে যাব। কিন্তু, নেমে একটু এগুতেই এক

জায়গায় হঠাৎ প্রায় বুক-জল! খরস্রোতও! প্যান্ট, জামা সব ভিজে একাকার। কী ভাগ্যিস, দুটো সেপাই দুদিকে আমার দুটো হাত ধরে জলস্রোত পার করে নিয়ে চলে। তারই মধ্যে আর এক ভয়াবহ দৃশ্য। আমারই কাছ দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জলঢোঁড়া সাপ জলের মধ্যে দিয়ে চলে গেল। আতঙ্কটা কাটলে মনে পড়ল, শ্রীকান্তের সেই নিশীথ অভিযান।

অপর পারের নিকটে পৌঁছুই। আবার বালির চর। পাড়ের কিছু দূরে আবছা অন্ধকারে একটা গ্রামের ঘরবাড়ি। সেই দিক লক্ষ করে এবার এগুনো। একটা ক্ষীণ আলোও জ্বলছে নদীর পাড়ের কাছাকাছি —একটা প্রকাণ্ড গাছ তলায়। একটা লোকও যেন সেখানে। একা? না কয়েকজন আছে,—বোঝা যায় না।

অফিসারের ইঙ্গিতে সিপাইরা বন্দুক রাইফেল প্রস্তুত করে এগোয়। আমি দুরু দুরু বুকে তাদের খানিক পিছনে থেকে চলি। ভাবি, দলটা এবার নির্ঘাৎ ধরা পড়ল। গোলাগুলি না চললেই বাঁচি!

অপরপারে আমাদের দল পৌঁছে যায়। নাঃ, লোক একটাই। গাছ তলা ছেড়ে লণ্ঠন হাতে সে এগিয়ে আসে। হাতে ওটা আবার কী! বন্দুক নয় ত? নাঃ—লাঠি। এসে বিনীতভাবে অফিসারকে সেলাম করে। বলে, হুজুর। হাম ইসি গাঁওকে চৌকিদার। আজ আপলোক আরহে কাল খবর মিল গিয়া। আপলোককে মদৎ করনে আয়া। চলিয়ে গাঁও মে। গ্রামের মধ্যে ঢুকে দেখা যায় দু একটা ঘরের দেওয়ালে কয়লা দিয়ে লেখা, চারু মজুমদার জিন্দাবাদ। গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, তিন ঔরৎ থা, তব কাল খা পিকে আরামসে চলা গিয়া।—কাঁহা গিয়া মালুম নেহি। চট্টরাজ কাহিনী শেষ করে বলেন, ওঃ! সেদিনের আমার সেই অভিজ্ঞতা ভোলবার নয়। কিন্তু একেই বলে, বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো!

পরাণদা চলে গেলেন
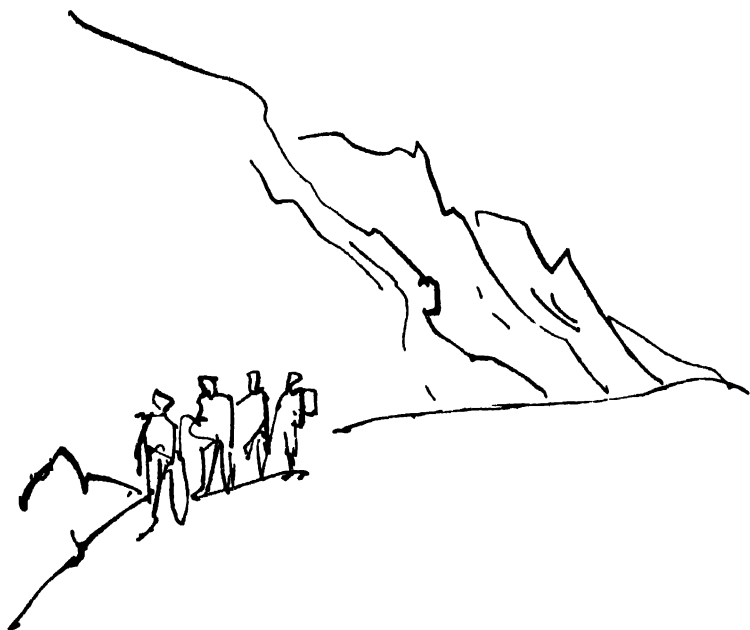
পরাণ ছিল শিশিরদার ডাকনাম। আমি, কিন্তু, তাঁকে শিশিরদা বলেই ডেকে এসেছি। আমার চেয়ে বয়সে তিনি বছর সাতেকের বড় ছিলেন। কলেজে বড়দার সহপাঠী বন্ধু, সুভাষচন্দ্রেরও। সেই শিশিরদা চলে গেলেন। বয়স হয়েছিল ৯২/৯৩ বছর। তাই, পরিণত বয়সেই তাঁর চলে যাওয়া। জীবনের শেষ কয়েক বছর অসুস্থ দেহে গৃহবন্দী হয়ে তাঁকে কাটাতে হয়। অথচ সারাজীবন তিনি ছিলেন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত। যদিও, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্কের মতনই জগতের ও সংসারের সঙ্গে ছিল তাঁর অন্তরের নিবিড় সংযোগ—True to the Kindred point of Heaven and Home।

পরিচিত মহলের বাইরে শিশিরদাকে কেউ চিনত না। নাম ছড়িয়ে পড়ার মতন তিনি কিছু করেনও নি। অথচ, বনস্পতি তার ফল ফুল ছায়ার প্রচারে প্রসিদ্ধ হলেও যেমন দাঁড়িয়ে থাকে ভূতল অন্তরালে অদৃশ্য শিকড়গুলির প্রভাবে, জগতে মানবসমাজও তেমনি গাঁথা থাকে শিশিরদার মতনই অজ্ঞাত পরিচয় মানুষের অলক্ষ্যে-কাটিয়ে-যাওয়া

জীবনসূত্রে। তাঁরই জীবনের কয়েকটি কাহিনী শোনাই।

প্রথমে তাঁর পারিবারিক কথা বলি।

সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। এম এ ও আইন পরীক্ষা পাশ করে হাইকোর্টের উকিল হন। কোর্টে যেতেনও। কিন্তু, গাউন-গায়ে ওকালতি করতে তাঁকে ক্বচিৎই দেখেছি। অথচ, সদাব্যস্ত কর্মী পুরুষ। কী কাজে ব্যস্ত? পরে বলছি।

শিশিরদা নিজের পারিবারিক জীবনে মর্মান্তিক শোক পান। তবুও, তাঁর কথাবার্তায়, আচার আচরণে সেই শোকের কোন ছায়াই প্রকাশ পেতে দেখিনি। ১৯২০ সালের আগে তাঁর বিবাহ হয়। ভাগলপুরের বিখ্যাত 'রাজা' শিবচন্দ্রের পরিবারে। একটি পুত্রসন্তানও জন্মায়। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই স্ত্রী বিয়োগ ঘটে। পুত্রটিকেও তার কিশোর অবস্থায় হারান। এই কারণেই হয়ত তাঁর সংসার ছড়িয়ে পড়ে বৃহত্তর ক্ষেত্র জুড়ে।

সেকালের যৌথ পরিবার। শিশিরদার ভাই তাঁর চেয়ে কয়েকবছরের ছোট। ডাক্তার। শিশিরদা তাঁরই সংসারের কর্তা। বাড়ির সব কিছু কাজকর্ম তাঁরই তত্ত্বাবধানে। কিন্তু, শুধু কী সেই সংসারের দেখাশুনা? ভগিনীদের, আত্মীয় পরিজনের, বন্ধুবান্ধবের সংসারেও সুখে দুঃখে সব সময়েই শিশিরদা হাজির।

সকাল থেকে টো টো করে ঘোরেন চরকির মতন। কোথায় কার কীসে সাহায্য করতে পারেন।

তাঁর পরিচিত মহলে তিনি যেন সর্বত্রই আলো বাতাস,—এমনি সহজ, সাধারণ, অথচ প্রাণস্বরূপ। আর, তাই-ই কী তাঁর ডাকনাম হোল—পরাণ?

কোথায় নার্সিং হোম-এ কোন্ আত্মীয়ের কন্যার প্রথম সন্তান প্রসব হতে গেছে -"যাই একবার, খবর নিয়ে আসি, কী হোল? কেমন আছে?"

খবর পেলেন, বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়ের কার মৃত্যু হয়েছে। শিশিরদা তখনি উপস্থিত, 'কী ব্যবস্থাদি করতে হবে?'—তখনি কাজে লেগে যান। তারপর, শ্রাদ্ধের আয়োজনে বাজার করা,—"ফর্দ দাও, করে এনে দিই।"

শোকে সান্ত্বনা দিতে, বিপদে আপদে সাহায্য করতে, আবার

আনন্দোৎসবে প্রাণ খুলে যোগদান করতে সর্বত্রই শিশিরদা হাজির।

আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়িতে বিবাহোপযোগী ছেলেমেয়ে রয়েছে? সেখানে বিয়ের ঘটকালী করতেও—শিশিরদা।

এই সূত্রে তাঁর শ্বশুরালয়ের এক ঘটনা বলি।

বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যেই স্ত্রী বিয়োগ হলেও ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অটুট থাকে। শ্বশুর শাশুড়ির জীবিতকালে তো বটেই, তাঁদের অবর্তমানে শ্যালকদের আমলেও সেই যোগসূত্র ছিন্ন হয় না। তাঁর বৃদ্ধ বয়সেও দেখেছি মৃতদার সন্তানহীন জামাতা নিয়মিত জামাইষষ্ঠীর উপহার পাচ্ছেন। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সেই অচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতারই এই ঘটনা।

তাঁর এক ছোট শ্যালিকার খুবই আগ্রহ,—শান্তিনিকেতনে গিয়ে পড়াশুনা করেন। কিন্তু বাড়ির প্রাচীনপন্থী অভিভাবকদের এতে ঘোরতর আপত্তি। শিশিরদা তবুও তাঁকে নিয়ে গিয়ে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করিয়ে দেন, তাঁর অভিভাবক হয়ে দেখাশুনা করেন। শুধু তাই নয়। সেই শ্যালিকার শিক্ষা সমাপ্ত হলে নিজেই অনুসন্ধান করে এক উপযুক্ত সৎপাত্রের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করা,—সেও যেন শিশিরদারই কন্যাদায়!

এই ঘটনার প্রথম অংশটুকু কীভাবে জানতে পেরে এক বিশিষ্ট লেখিকা তাই শুধু অবলম্বন করে বাঙলা মাসিকপত্রে একটি সরস গল্প প্রকাশ করেন। নামও দেন, 'শিশিরবাবুর কীর্তি'। সেই কাহিনীতে লেখিকা এমনিভাবে ঘটনাবলী সাজান যেন শিশিরবাবু সেই শ্যালিকাকে নিজের আদর্শানুরূপ শিক্ষা দিয়ে নিজেই বিবাহ করতে আগ্রহী।

পত্রিকাটি শিশিরদার নজরে আসে। লেখিকা তাঁর অপরিচিতা। কিন্তু, হঠাৎ এক আসরে তাঁর দেখা পান। শিশিরদা সরাসরি তাঁর কাছে যান, নিজের পরিচয় দেন, প্রকৃত বৃত্তান্ত জানান এবং অভিযোগ করেন, এইভাবে তাঁর নামে অন্যায়ভাবে অসত্য প্রচার করা হয়েছে।

লেখিকাও পত্রিকার পরবর্তী এক সংখ্যায় সেই কাহিনীর জের টেনে প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে আবার লেখেন—'শিশিরবাবু মহত্ত্ব'!

শিশিরদা হাসতে হাসতে এই গল্প শোনান আমাদের।

আর একবার এক মজার ঘটনা।

সন্ধ্যাবেলা। শিশিরদা এলেন এক ঝলক সান্ধ্য সমীরণের মতন।

এসেই হাসিমুখে গল্প করেন, আজ আমার ভাগ্যে একটা মই লাভ হোল, —সত্যি ঘটনা। হাসবেন না। প্রকৃতই একটা মই। শুনুন ব্যাপারটা। সকালবেলা। ডাক্তার ভাই বাড়ির একতলার ঘরে তার চেম্বারে বসে রোগী দেখতে ব্যস্ত। এমন সময় দুটো লোক একটা মই কাঁধে নিয়ে এসে হাজির। ডাক্তার জিজ্ঞেস করে, কী চাই তোমাদের ?—তারা ঘরের 'সিলিং' ফ্যানটা দেখিয়ে বলে, ওটা খারাপ হয়েছে, মেরামত করতে এসেছি।—রোগী দেখার কাজে বাধা পাওয়ায় ডাক্তার অসুবিধা বোধ করে। তবু কাজ বন্ধ রেখে সরে বসে। ভাবে, দাদা পাঠিয়েছেন—মানতেই হবে। তারা মই খাটিয়ে একজন ধরে থাকে, অপরজন মই-এ উঠে খুটখাট করে কী কাজ করে। সময় যায়। ডাক্তার এবার বিরক্ত হয়, রোগীরা চুপচাপ বসে অপেক্ষা করছে। ডাক্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করে, তোমরা সময় নেবে কতোক্ষণ আর ? দেখ দিকি, আমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে। দাদার যেমন কাণ্ড, এই সময়েই লোক পাঠালেন পাখাটা মেরামত করতে। মিস্ত্রী বলে, বাবু, এ তো দেখছি একটু বেশি সময় নেমে সারাতে, খুলে নিয়ে গিয়ে কাজটা করলে ভাল হয়।—ডাক্তার বলে, তাই করো তা হলে।

তারা পাখা খুলে নামায়। পাখা ও মই নিয়ে ঘর ছেড়ে বার হয়। ঘরের বাইরে রোয়াক পেরিয়ে বাড়ির গেট দিয়ে লোক দুটো যখন বার হচ্ছে, আমি বাজার থেকে ফিরছি, সামনাসামনি দেখা। আমি তো তাদের দেখে অবাক। আমার অজ্ঞাতে বাড়ির কোন কিছু বাইরে যায় না, আর ফ্যান হাতে লোক বেরুচ্ছে একি ! ধমকে উঠে জিজ্ঞেস করি, কে তোমরা ? ফ্যান নিয়ে বেরুচ্ছ ?

লোক দুটোও তখনি পাখা আর মই ফেলে দে ছুট।

ঘটনা বর্ণনা করে শিশিরদা মন্তব্য করেন, বাড়িটার কিছু মেরামতের কাজ করব ভাবছি, একটা মই পেলে সুবিধে হয়।—চোরে চুরি করতে এসে মইটা দিয়ে গেল। ভগবানের অশেষ কৃপা দেখছেন ?

শিশিরদা ছিলেন মিতভাষী, মিষ্টস্বভাব। সবার সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার। তাঁর মুখে কখনও কঠোর ভাষা শুনিনি। কারও প্রতি রূঢ় আচরণ করতেও দেখিনি। এই কারণে কারও সঙ্গে তাঁর শত্রুতাও ছিল না। অথচ, যে কাজে লাগতেন সেই কাজে লেগে থেকে কার্যোদ্ধারে তাঁর কুশলতা ছিল অদ্ভুত।

তাঁদের পাড়ায় শীতলাপুজো হয়। একটা ফাঁকা পোড়ো জমিতে সেই শীতলাতলা। জমির মালিক উত্তর কলকাতার এক ধনী ব্যক্তি। এ-জমি বহুকাল ঐভাবে খালি পড়ে আছে তিনি খোঁজ খবর রাখেন না। হঠাৎ তিনি সজাগ হন। এইভাবে তাঁর বিনা অনুমতিতে জমি ব্যবহার হচ্ছে খবর পেয়ে বাধা দিতে আসেন। পাড়ার লোকেদের সঙ্গে বিবাদ বাধে। শিশিরদা তাঁকে অনুরোধ করেন, জমির একপ্রান্তে একটু অংশ ছেড়ে দিতে।—তিনি রাজি হন না। দখলকারীদের উচ্ছেদ করে জমি দখলের জন্যে আলিপুর কোর্টে মালিক মামলা রুজু করেন। প্রথম প্রতিবাদীর নাম—শিশিরদার!

শিশিরদা দেখি এই নিয়ে কদিন খুব ব্যস্ত,—মামলা লড়ে জিততেই হবে। প্রতিবাদীর জবাব দাখিল করেন। তাতে বলেন, পঞ্চাশ বছরেরও ওপর জমির মালিকের বিরুদ্ধতা সত্ত্বে জমি বেদখল থাকায় মালিকের স্বত্ব লোপ হয়েছে।

তারপর, এতোকাল বেদখলের সাক্ষী প্রমাণ জোগাড়ে লেগে যান। পাড়ার যতো বৃদ্ধাদের গিয়ে ধরেন, সাক্ষী দিতে হবে, জমির ওপর প্রকাণ্ড গাছটার তলায় যে পাথরের শিবলিঙ্গগুলি রয়েছে, গঙ্গাস্নান থেকে ফেরার পথে তাঁরা প্রতিদিন শিবের মাথায় জল দেন, বহু বছর ধরে ওখানে নিত্য পুজো হয়ে আসছে।

বহু সাক্ষীর নাম কোর্টে দাখিল হয়।

অবশেষে মামলার গতিক দেখে মালিক আপস করতে রাজি হন। জমির একপাশের খানিক অংশ শীতলাদেবীর জন্য দান করে পুণ্য অর্জন করেন।

শিশিরদার এর পর ভাবনা, জমি তো হল, এখন শীতলাদেবীর একটা পাকা মন্দিরও করতে হয়। অমনি চাঁদা তোলাও শুরু হোল। অর্থ সংগ্রহও হতে থাকে। মন্দির গাঁথাও আরম্ভ হয়। কিন্তু, সিমেন্টের অভাব। পারমিটের দরখাস্ত করেন। দপ্তরে ছোটাছুটি করেও পারমিট পেতে দেরী হয়। কাজ আটকে যায়। তখন সটান চলে যান পারমিট দেওয়ার অফিসারের কাছে। অফিসার ফাইল আনিয়ে দেখেন। বলেন, আপনার দরখাস্তের আগে-করা আরও অনেকের দরখাস্ত রয়েছে দেখছি। আপনার টার্ন আসতে দেরী হবে। অপেক্ষা করুন। যথাসময়ে পেয়ে যাবেন।

শিশিরদা অনুনয় করেন, দেখুন, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে চাইছি না,—মন্দির হচ্ছে, কাজ আটকে রয়েছে, বর্ষা এসে যাচ্ছে, 'স্পেশাল কেস' করে যদি এখুনি করে দেন।

অফিসার কড়া লোক। যুক্তিযুক্ত কারণ দেখিয়ে বলেন, তা করা চলে না। লিস্টে আপনার নিচের দরখাস্তকারীকে ঐ ভাবে আপনার আগে দিলে তখন আপনারাই তো আপত্তি করতেন। নিয়মমতই কাজ করতে আমরা বাধ্য।

শিশিরদা অগত্যা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, সত্যিই, নিয়মভঙ্গ করে আপনার পক্ষে এখনি দেওয়া মুশকিলই বটে দেখছি। যাক ফিরে যাই, শীতলা-মাকে গিয়ে জানাই, মা, বর্ষায় তুমি খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ভেজো, অফিসার সিমেন্ট দিতে পারলেন না, নিয়মবিরুদ্ধ হবে, —তবুও, মা শীতলা তুমি যেন অফিসারকে দয়া কোরো।

অফিসার চমকে ওঠেন, শীতলার দয়া। বলেন, কী বললেন? শীতলার মন্দির? এতোক্ষণ ও-নামটা করেননি কেন? দেখি, ক'বস্তা সিমেন্ট চাই আপনাদের? ওতেই হবে? আরও বরং দু বস্তার বেশি পারমিট নিয়ে যান।

শিশিরদা সেইদিনই পারমিট পেয়ে যান।

অফিসার নিজে থেকেই আবার বলেন, মন্দির তুলছেন—চাঁদা তুলে নিশ্চয়? নিন্ মশাই,—আমারও কিছু ডোনেশান। ভাল করে পুজোটা দেবেন যেন।

এই রকমই ছিল শিশিরদার কতো বিজয় কীর্তি।

শিশিরদার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কয়েকজনই নাট্য ও সিনেমা জগতে সুবিখ্যাত। শিশিরদা তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগও রাখেন। এর জন্যে তাঁকে একবার দুর্ভোগও ভুগতে হয়। সেবার কলকাতায় তাঁর বাড়িতে এক বিবাহ উৎসব। তিনিই সেখানে তার কর্মকর্তা। কলকাতা ও বম্বের ক'জন নাম-করা সিনেমা 'স্টার'—সবাই তাঁর নিকটআত্মীয়—উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন। কি-করে তাঁদের উপস্থিতির সংবাদ পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, তাঁর বাড়ির সুমুখে রাস্তায় বিরাট জনতা। তাদের দাবি, —স্টারদের বাইরে বার হয়ে দাঁড়াতে হবে—তারা দেখতে এসেছে, না দেখে নড়বে না। লোকদের বললেও শোনে না, —শুভানুষ্ঠান শুরু হয়েছে, তাঁরা সবাই ব্যস্ত.—আসার অসুবিধা

আছে। ভিড় আরও বাড়তে থাকে—নিমন্ত্রিতদের বাড়িতে ঢোকার পথ থাকে না, —জনতা উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। অবশেষে কাজকর্ম ফেলে সেই স্টারদের জনতার সামনে এসে দাঁড়াতেই হয়। শিশিরদা বলেন, দেখুন দিকি, দিনকাল কি হয়েছে, আর লোকজনদের কী আবদার ও কাণ্ডকারখানা!

আর একবার তাঁর এক অভিনেতা ভাগ্নের এক সকরুণ কাহিনী শুনি। তাঁর সেই ভাগ্নে কলকাতার রঙ্গালয়ে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করে। একটি নাটকে সে এক বিকলাঙ্গ কদাকার বিকটমূর্তি পুরুষের চরিত্রে নেমে সাজসজ্জা মেক-আপ করে নিজের স্বাভাবিক চেহারা এমনি সম্পূর্ণ ঢাকা রাখত যে কারও সাধ্য নেই বোঝে সে নিজে অতি সুশ্রী, সুপুরুষ। সেই নাটক শুনেছি বছরখানেক চলে এবং দীপকের সুনিপুণ অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা দর্শক মহলে ছড়িয়ে পড়ে। সদাপ্রসন্ন শিশিরদাকে কদিন ধরে বিশেষ বিষণ্ণ দেখে একদিন জানতে পারি তাঁর সেই অতিস্নেহের ভাগ্নে দীপকের গুরুতর রোগ ধরা পড়েছে, —ক্যান্সার! অসহ্য যন্ত্রণায় মাঝেমাঝে ভোগে অথচ লোকজন দেখা করতে এলে সবারই সঙ্গে হাসিমুখে সহজ স্বচ্ছন্দভাবেই আলাপ করে, —সেই সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হয়েও এ যেন তার নিজের জীবনেই জীবন্ত অভিনয়।

এরপর একদিন শিশিরদা এসে জানান, সব শেষ হয়ে গেল। দীপক চলে গেল। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, শুনলে বিশ্বাস করবেন কি না কী জানি, কিন্তু নিজের চোখেই এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম। তার মৃত্যুর কিছু আগে তার সেই সুশ্রী সুন্দর মুখখানি অদ্ভুত রকম বদলে যায়। সে যেমন থিয়েটারে বিকৃত মূর্তির মেক-আপ করতো, তার চেহারা আশ্চর্যভাবে সেইরকম হয়ে গেল—তাকে আর চেনাই যায় না। জীবনের শেষ মুহূর্তেও মৃত্যুশয্যায় এ এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য সে দেখিয়ে গেল। কী করে এ ঘটল, তাই ভাবি।

শিশিরদার সঙ্গে আমার দীর্ঘকাল জানাশোনা থাকলেও অন্তরঙ্গতা হয় হিমালয়-পথে তাঁকে সঙ্গী পেয়ে। এক বছর নয়। কয়েক বছরই। সেই সেকালের সুদুর্গম গোমুখ যাত্রায়, —পাওয়ালীর পথে—মদ-মহেশ্বরে, —রুদ্রনাথে, —শতোপন্থে, —হিমালয়ের পথে আরও কয়েকবারই। কোথাও যাত্রা করছি খবর পেলেই উৎসাহিত হয়ে হাজির

হন, —"কবে ? কোন ট্রেনে ? আমিও যাব। একদিন আগেও খবর পেলে যেতে তৈরি।" সংসারে, সমাজেও যেমন, পথে প্রবাসেও তেমনি তিনি আদর্শ সঙ্গী।

সুশ্রী চেহারা। ফরসা রঙ। সাধারণ গড়ন। দেখতে কৃশকায় মনে হলেও চওড়া হাড়গোড়। পরিশ্রমী। কর্মঠ। এবং সবার উপরে তাঁর মস্ত গুণ, থাকা খাওয়ার কোন হাঙ্গামা নেই। পাহাড়ে একটা শতরঞ্চি বা কম্বলের ওপর গেরুয়া রঙের একটা চাদর বিছিয়ে, হাওয়া-বালিশ থাকলে তার ওপর নয়ত একটা পুঁটলির ওপর মাথা রেখে, চাদর বা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেই তাঁর অগাধ ঘুম। আর খাওয়া দাওয়া ? যেখানে যখন যেমন পাওয়া যায়। কিছু খেতে পেলেই হোল,—রান্না যেমনি হোক। মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই সব কারণে তাঁর মালপত্রও থাকত ন্যূনতম। পাহাড়ে হাঁটিতেনও ধীরে ধীরে—আপন শক্তি ও দম বুঝে। বিপদসংকুল বা দুর্গম পথেও ভয় পেতেন না। হিমালয়ের পথে তাঁর সঙ্গে ভ্রমণের সুযোগ—আমার এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা। তার কিছু কিছু বিবরণ আমার সেই সব যাত্রাকাহিনীতে দেবার চেষ্টা করেছি।

হিমালয়কে তিনিও যে কতো গভীর ভালবাসতেন তা দেখলাম তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকালেও। তাঁর চলে যাওয়ার কয়েকমাস আগে কলকাতায় এসেছি। তাঁকে দেখতে গেলাম। বিছানার ওপর উঠে বসলেন। বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সে কী নিবিড় সস্নেহ আলিঙ্গন। তারপর প্রশ্ন—এক এক করে সবারই নাম করে—কে কোথায়, কেমন আছে ? স্মৃতিশক্তি তখনও তেমনি প্রখর। সবারই প্রতি হৃদয়-ভরা অনাবিল প্রীতি ও স্নেহ তেমনি উদ্বেল। তারপর বলেন, চুপচাপ শুয়ে পড়ে আছি, বই পড়ে সময় কিছু কাটছিল, এখন আর পড়তে পারছি না, চোখটায় মোটেই দেখতে পাচ্ছি না, এখন কেবলি চোখের ওপর ভাসে হিমালয়-পথের দিনগুলির সেইসব কতো স্মৃতি,—সেই শতোপন্থ থেকে মহাপ্রস্হানের পথের দৃশ্য ! তাই ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়ি।

এইভাবেই হয়ত তাঁর চোখে নেমেছিল তাঁর শেষ ঘুম, স্বপনের মধ্যেই শিশিরদার শেষ যাত্রা—সেই মহাপ্রস্থানের পথে !

হঠাৎ আলোর ঝলকানি

আইন আদালত কথাটা শুনলেই সাধারণত মনে হয় একটা গুরুগম্ভীর পরিবেশ। হাস্য পরিহাসের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। সে-রাজ্যে যাঁদের অধিষ্ঠান, তাঁদের যেন গোমড়া মুখে রসকষহীন কর্তব্য কাজ করে যাওয়াই প্রথা। সুকুমার রায়ের ভাষায়, সেখানে যেন 'রামগরুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা'। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে আদালতের থমথমে আবহাওয়ার মাঝে বিচারকেরও গুরুগম্ভীর মুখে হঠাৎ একটা সরস মন্তব্য লঘু হাস্যরসের সৃষ্টি করে।

এই ধরণের বহু ঘটনার বর্ণনা বিদেশী বই-এ পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও হয়ত কিছু লেখা হয়েছে। আমার জানা দু'একটা ঘটনা এখানে বলি।

আলিপুর আদালত। তখন ব্রিটিশ রাজত্ব। জেলা জজের কোর্ট। বিচারক খাস বিলাতী সাহেব। আই-সি-এস। এইসব আই-সি-এস্ সাহেবদেরও চাকরিতে যোগ দেবার পর প্রাদেশিক কোন ভাষা শিখে পরীক্ষা পাশ করতে হোত। ফলে, যাঁরা বাঙলা দেশে চাকরি করতেন তাঁরা সবাই অল্পবিস্তর বাঙলা জানতেন,—অবশ্য সাধারণত সে-আমলের প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের সাধুভাষা।

সেদিন সেই সাহেব জেলাজজের কোর্টে তখন যে মামলার শুনানি হচ্ছে তাতে দুই তরফে দুজন সিনিয়র উকিল। বাদীর উকিল দাঁড়িয়ে যথারীতি ইংরেজিতে তাঁর বক্তব্য পেশ করছেন, অপরপক্ষের উকিল তাঁর সেই বক্তৃতার মাঝে মাঝেই বার বার বাধা সৃষ্টি করে মন্তব্য করতে থাকেন। দুই পক্ষের উকিলের মধ্যে কথাকাটাকাটি শুরু হয়। জজ তাঁদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিছুক্ষণ শান্তিতে কাজ চলে। কিছু পরে আবার বিবাদী উকিলের অযথা বাধা সৃষ্টি। বাদীর উকিলও স্বভাবতই ধৈর্য হারান, রেগে যান। জজ চুপ করে দেখেন। ওদিকে দুই উকিলের মধ্যে তখন ভীষণ বচসা। কোর্টের সময় নষ্ট

হয়। জজ সাহেব কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে হঠাৎ তাঁদের বাদ প্রতি-বাদের মাঝে বিশুদ্ধ বাঙলায় বলে ওঠেন, বাওবা! বাওবা! বাদ্যকর বেশ ঢোল বাজাইটেছেন। চোমটকার! (দুই পক্ষের উকিলের একজনের পদবী—'ঢোল', অপরজনের 'বাদ্যকর')।

হঠাৎ সাহেব জজের মুখে বিশুদ্ধ বাঙলায় এই রসাল মন্তব্য শুনে দুই উকিলই হেসে ওঠেন, শান্ত হন। কোর্টের কাজও শান্তিতে আবার শুরু হয়।

দ্বিতীয় কাহিনীর পটভূমি হাইকোর্ট চত্বর।

কান্তিচন্দ্র মুখার্জি ছিলেন এটর্নি। আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাঁর সঙ্গে অন্যসূত্রে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি ছিলেন সুরসিক মজলিসী ব্যক্তি। অ্যামেচার থিয়েটারে ভাল অভিনয়ও করতে পারতেন। কলকাতা ইউনিভার্সিটি হলে শিশির ভাদুড়ী, নরেশ মিত্তিরদের সঙ্গে তাঁকে অভিনয় করতে দেখেছি। সেই কান্তিবাবু হাইকোর্টের 'অফিসিয়াল্ রিসিভার' নিযুক্ত হলেন। ইংরেজ আমলের হাইকোর্টের এক ক্ষমতাপন্ন বড় অফিসারের পদ। তাই অফিসে তিনি মিষ্টার কে সি মুখার্জি। সাহেবী বেশভূষা। দপ্তরে অফিসিয়াল কাজকর্ম পরিচালনাকালে মুখে ইংরেজি বুলি। পুরাদস্তুর বিলাতী আচার আচরণ, অফিসে কড়াকড়ি নিয়মকানুনও।

সেদিন কোর্টে তাঁর দপ্তরে আমি একটা কাজে গিয়েছি। কাজ শেষ হলে বসে দুএকটা এমনি কথাবার্তা হচ্ছে—বাঙলাতেই; ঘরে তখন আর কেউ নেই। এমন সময় অফিসের এক তরুণ কর্মী—সুশ্রী নিরীহ দেখতে—একটা ফাইল হাতে জড়সড় হয়ে এসে দাঁড়াল। তিনি ফাইলটা হাতে নিয়ে তাকে ইংরেজিতে কী যেন নির্দেশ দিলেন।

ছেলেটি তার কথা শুনে বুঝতে না পেরে নার্ভাস হয়ে বলে উঠল—'এনকোর-এনকোর স্যার।' মিস্টার মুখার্জি কোন রকমে হাসি চেপে তখনি স্পষ্ট উচ্চারণ করে শুধু বলেন, নাউ ইউ মে গো।—ছেলেটিও তখনি চলে যেতেই তাঁর হাসি ফেটে পড়ে, কোন রকমে সামলে নিয়ে বলেন, দেখ দিকি কান্ড! ছেলেটা থিয়েটারে চমৎকার মেয়েদের পার্ট করতে পারে (সেকালে অ্যামেচার থিয়েটারে পুরুষরাই মেয়েদের পার্টে সাজত) আমাকে এসে ধরলে একটা চাকরির জন্যে। একটা পোস্ট সম্প্রতি খালি হতে ওকেই কাজটা দিয়েছি। থিয়েটারে

ঐ মেয়ে সাজা ছাড়া আর কোথাও কাজকর্ম করেনি। আমার অর্ডারটা বুঝতে না পারায় আবার বলবার জন্যে তাই বলে উঠল, এনকোর-এনকোর !—বলে আবার মিস্টার মুখার্জির হাসির উচ্ছ্বাস !

তৃতীয় কাহিনীর পরিবেশ একেবারে হাইকোর্টের জজের এজলাসে। সেও তখন ব্রিটিশ আমল। জজও খাঁটি বিলাতী সাহেব। বর্মা হাইকোর্টে ছিলেন। সেখান থেকে এখানে আসা। বিশাল চেহারা। গোল মুখ,—বুলডগ-এর মত। লাল টক্‌টকে রঙ্। কী গুরুগম্ভীর মূর্তি ! গ্রীষ্মের সকালে পরিষ্কার আকাশে ওঠা যেন রক্তবর্ণ সূর্য ! এজলাসে এসে যখন বসেন—অতো প্রকাণ্ড কোর্টরুম, কোথাও একটু টুঁ-শব্দ নেই। তাঁর একার উপস্থিতিতেই সারা কামরা যেন গম্‌গম্ করে। উকিল, ব্যারিস্টার, পেশকার, চাপরাসী সবাই সন্ত্রস্ত থাকে। গম্ভীর চালে তিনি কোর্টের কাজকর্ম করে যান—মামলা মোকদ্দমা শোনেন, আপন মত অনুযায়ী রায় দিয়ে যান, তাঁর সেই রক্তবরণ বুলডগী মুখ দেখে কারও বোঝবার সাধ্য নেই, কোন মামলার কী ফল হবে।

কোর্টের মানমর্যাদা, নিয়মকানুন—এমন কি পরিবেশও যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকেও তাঁর কড়া নজর। একদিন তো ফজলুল হক সাহেব (তিনি তখনও অতো স্বনামখ্যাত হননি) তাঁর কোর্টে এসেছিলেন কদিন দাড়ি না কামিয়ে—তাঁর মুখ-ভর্তি খোঁচা দাড়ি নিয়ে। মামলা করতে উঠে দাঁড়াতেই সেই সাহেব জজ তাঁকে গম্ভীর মুখে বলেন, মিস্টার হক্, আপনার মামলা আজ মুলতুবি রাখলাম, আপনি দয়া করে দাড়ি কামিয়ে তবে কেস করতে আসবেন, তখন শোনা যাবে।—হক সাহেবকে ধীরে ধীরে চলে যেতে হয়।

সেই সাহেব জজেরই এজলাসে একদিনের ঘটনা।

এক উকিল দাঁড়িয়ে তাঁর মামলার আরগুমেণ্ট করছেন। ডায়াস-এ বসে জজসাহেব চুপ করে শুনছেন। নিচে প্রথম সারির চেয়ারে অন্য উকিল ব্যারিস্টার কয়েকজন চুপচাপ বসে—পরে তাঁদের মামলারও হয়ত শুনানি হবে। পিছনের কয়টা বেঞ্চে জন কয়েক মক্কেল বা তাদের তদ্বিরকারক বসে। সেই দিক থেকে হঠাৎ একটা গরর্ গরর্ আওয়াজ শোনা গেল প্রথমটা মৃদু, তারপর থেকে-থেকে বেশ জোরে !

সবাই ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকায়। সম্ভবত একটা মক্কেলই হবে,

—বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে,—তারই নাসিকাধ্বনি! সেই নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড কোর্টরুমে শব্দটা একবার বিকটভাবে গরর্-গোঁ-ফুস করে উঠে প্রতিধ্বনিত হোল। উকিল বক্তৃতার মাঝে থেমে গেছেন, জজসাহেবেরও কঠোর দৃষ্টি সেই দিকে। লোকটারও হয়ত নিজের নাসিকাধ্বনিতেই ঘুম ভেঙেছে।

স্বভাবতই এমন পরিস্থিতিতে সেই কড়া জজসাহেব ঘটনাটাকে উপেক্ষা করতে পারেন না। পেশকারকে বলেন, লোকটাকে ডাকাও, সাক্ষীর কাঠগড়ায় ওকে দাঁড়াতে বল।

চাপরাসী তাকে ডেকে আনে। ইতিমধ্যে সে জানতে পেরেছে কী ভীষণ কাণ্ড করে ফেলেছে। তার বেশভূষা দেখে মনে হয়, গ্রামের লোক। বোধহয় এ-কোর্টে তার মামলা আছে, তাই অপেক্ষা করছিল। হয়ত কোন দূর গ্রাম থেকে এসেছে, রাতে ঘুম হয়নি, এখন চুপ করে বসে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কোর্টের মধ্যে থমথমে আবহাওয়া। বোঝাই যাচ্ছে, কোর্টের মধ্যে কাজের সময় জজের সামনে বসে নাক ডেকে ঘুমানো!—কোর্ট অবমাননার অপরাধে নির্ঘাৎ জেল! বেচারী! এই কড়া সাহেব জজ! কোন নিস্তার নেই।

বিচার আরম্ভ হয়। সেই সাক্ষীর কাঠগোড়ায় উঠে দাঁড়িয়ে সে। কী ভয়ার্ত অসহায় করুণ মুখের চেহারা। ঠকঠক করে বেচারী কাঁপে। তার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি ফেলে সাহেব জজ পেশকারকে বলেন, একে জিজ্ঞাসা করো, ও কি ইংরেজি বোঝে?

পেশকার প্রশ্ন করে জেনে জজকে বলেন, নো মি লর্ড।

জজ,—ওকে এবার জিজ্ঞাসা করো, ও কী এটা জানে যে কোর্টের মধ্যে সে কী গুরুতর অপরাধ করেছে। পেশকার লোকটিকে সেই প্রশ্ন বলে চুপিচুপি আরও বলেন, হাত জোড় করে দাঁড়া, ক্ষমা চা'।

লোকটিও সেই মত দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় বলে, জানি, ধর্মাবতার, —ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—মহাদোষ করে ফেলেছি—ক্ষমা চাইচি।

পেশকার জজসাহেবকে ইংরেজিতে তার কথাগুলি জানান।

জজসাহেব দুবার মাথা নাড়েন গম্ভীর মুখে। কোর্টরুমে থমথমে ভাব। সবাই উৎকণ্ঠিত। যা নিয়মনিষ্ঠ সাহেব জজ, ঐ রক্তরাঙা বুলডগী মুখে লেশমাত্র করুণার চিহ্ন নেই। জেল তো হচ্ছেই।

বেচারী! জজ সাহেব বজ্রগম্ভীর স্বরে পেশকারকে বলেন, পেশকার! লোকটাকে জানাও, কোর্টের মধ্যে ঘুমিয়ে-পড়া তার ঘোরতর অপরাধ, —আর কখনও যেন এমন না করে। কোর্টে বসে ঘুমোবার বিশেষ এক্তিয়ার—একটু থেমে বলেন—একমাত্র জজেদের!—it's a Privilege only of the Judges!

কোর্টরুমেও হঠাৎ যেন ঘনঘটা মেঘে ফুটে ওঠে হঠাৎ-আলোর ঝলকানি!

ভ্রমণ : তখন আর এখন

আমার ভ্রমণের 'সেকাল'—'একাল' থেকে ষাট সত্তর বছর আগে শুরু।

সেকালে দেশ ছিল পরাধীন। ব্রিটিশ-শাসিত। দেশবাসীর ভ্রমণের বাসনা মেটাতে, বা স্পৃহা জাগাতে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা ছিল না। ছিল শুধু রেলভ্রমণে টিকিটের 'কনসেশন'। অনায়াসে টিকিট পাওয়ার সুব্যবস্থা। যাত্রীর ভিড়ও হত কম। ট্রেনে নিয়মকানুন মানাও ছিল লোকেদের রীতি। সে আমলে রেলভ্রমণের তাই সুখ-সুবিধা ছিল। দূরপাল্লার ট্রেনে কোথাও যেতে হবে ভাবলেই মন আনন্দ ও উৎসাহে মেতে উঠত।

সেকালে আমাদের 'ভ্রমণ' মানে ছিল সাধারণত প্রবাসে কোথাও গিয়ে থাকা। সেইখানে ছুটির দিনগুলি কাটানো। সেই স্থানকে কেন্দ্র করে হয়তো আশপাশেও ঘুরে ঘুরে দেখা। একালের মতন, কয়েকদিনের মধ্যে নানা স্থান ঘুরতে বেরোনোর যাত্রীসংখ্যা ছিল কমই।

সেকালে অবশ্য আর একপ্রকার ভ্রমণ হত তীর্থ যাত্রায়। সে ভ্রমণের আকর্ষণ থাকত পুণ্যকামীদের, বিশেষত বয়োবৃদ্ধদের। এ সব ভ্রমণই ছিল আনন্দদায়ক।

একালে ভারত স্বাধীন। যুগেরও পরিবর্তন ঘটেছে। দেশকালের প্রভাবে মানুষের মনও বদলেছে। দৃষ্টিভঙ্গিরও পার্থক্য এসেছে। ভ্রমণের স্থানগুলি নামে এক থাকলেও রূপান্তর স্বাভাবিক। স্বাধীন দেশে নূতন দৃষ্টি নিয়ে ভ্রমণের সুখ-সুবিধার জন্য নানাবিধ আয়োজনের চেষ্টাও চলেছে। ভ্রমণার্থীরা দলে দলে এখন বেড়িয়ে পড়ে তারই সুযোগ নিতে। যাত্রীসংখ্যাও দিন দিন বাড়তে থাকে। সেকালের শান্ত জনবিরল তীর্থস্থানও এখন যাত্রীবহুল 'টুরিস্ট সেন্টারে' পরিণত হয়। ভ্রমণের এই রূপভেদ হলেও ভ্রমণের আনন্দ, আনন্দই থাকে,—যে যেভাবে যেমনই পাক এবং তারই আকর্ষণে মানুষকে এখনও পথে টানে।

কিন্তু একালে দূরপাল্লার ট্রেনে যাত্রার সেই আনন্দ আর নেই। টিকিটের 'কনসেশন' উঠে গেছে। টিকিট পাওয়ারও হয়রানি। সর্বক্ষেত্রে ঘুষের প্রবর্তন। এই সেদিন এক বড় দল কেদার-বদরী ভ্রমণ করে এলেন। এঁরা নিছক তীর্থযাত্রী। পুণ্যার্জনের আশায় যাওয়া। ভদ্রলোক যাত্রার বিবরণ দিলেন। বেশ ভালভাবে আনন্দে ঘুরে এসেছেন। ফেরবার সময় রেলের টিকিট পেতে অসুবিধা হয়নি? প্রশ্ন করায় অম্লান বদনে নির্দ্ধিধায় জানালেন, "নাঃ। প্রতি টিকিটের মাশুলের ওপর পনেরো টাকা করে বেশি দিতে হল। দিয়ে দিলাম।" আশ্চর্য হয়ে বলি, "সে তো প্রায় চারশ টাকা বেশি দিলেন।' তিনি হেসে বলেন, "তাতে কী!"

ভাবি, তীর্থ-ফেরত যাত্রীর চোখেও ঘুষ দেওয়াটা যে অপরাধ সে বোধ লুপ্ত হয়েছে। আবার তখনই মনে আসে, একালে ট্রেনে যাত্রীর কী অসম্ভব ভিড়। ট্রেনে নিয়মকানুন না-মানাই এখন যেন রীতি। একালে ট্রেন ভ্রমণে দুর্ভোগের অন্ত থাকে না।

এবার হিমালয়-ভ্রমণের সেকাল-একাল বলি। সুপরিচিত কেদার-বদরী যাত্রার কথাই ধরা যাক।

১৯২৮। সেই আমার প্রথম ওই পথে যাওয়া। প্রকৃত হিমালয় ভ্রমণ। তখন ছিল হৃষীকেশ থেকে পায়ে-হাঁটা পথ। যেতে আসতে

প্রায় চার শ' মাইল। সময় লাগত একমাস। যাত্রার শুরুতে ঠিক হয়, প্রতিদিন দুবেলায় দশ মাইল করে হাঁটব। কিন্তু, যাত্রা শেষে দেখা যায়, গড়পড়তা দৈনিক হাঁটা হয়েছে, ষোল মাইল করে। এর কারণ বলি। পাহাড় পথে হাঁটার পরিশ্রম থাকে ঠিকই। কিন্তু, পাহাড়ে চলতে হয় নিজের সামর্থ্য বুঝে, পায়ে-চলার ছন্দ রেখে, পাহাড় পথের সঙ্গে যেন সুর মিলিয়ে, হিমালয়ের প্রাকৃতিক রূপে মন রাঙিয়ে। হিমালয়ে পথ চলার অসীম আনন্দ তখন দেহের সব ক্লান্তি, সব অবসাদ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সামনের পথ কেবলই ডাক দিতে থাকে এগিয়ে যেতে। হিমালয়ে প্রকৃতই পথ চলাতেই আনন্দ।

সেকালের সেই যাত্রা-পথের আশ্রয়স্থানেরও কথা বলি। দু'তিন মাইল অন্তর চটি, ন' মাইল অন্তর ধর্মশালা। মাটি ও পাথরে তৈরি সে-সব ঘর। চটিগুলি দরজা-জানলাবিহীন। একদিক সম্পূর্ণ খোলা, লম্বা দালানের মতন। এবড়ো-খেবড়ো মাটির মেঝে। তারই উপর চাটাই বিছিয়ে যাত্রীদের শয্যাপাতা। অসমতল মেঝে দেহে অস্বস্তি জাগালেও মনে মজা অনুভব করতাম। এ-পথের এইসব অসুবিধা খুশি মনে মেনে নেওয়াতেই ভ্রমণের ছিল আনন্দ। চটিতে ধনী-নির্ধনের ভেদাভেদ ছিল না। সবাই যাত্রী, একই পথের পথিক। এই যাত্রা পথেরই বর্ণনা দিতে ভগিনী নিবেদিতা লেখেন, এই যাত্রা পথে গেলে বোঝা যায়, ভারত এক মহাদেশ ও ভারতবাসী এক মহাজাতি। এইখানেই দেখা মেলে সেই জাতির সমগ্রতার এক অভিন্ন মূর্তির! বাস্তবিকই, তখন চটিতে অপরিচিত যাত্রীও হত যেন পরম আত্মীয়। আর, গ্রামবাসীরা ও চটি-অলাও হয়ে উঠত আপনজন। যাত্রীদের নিঃস্বার্থ সেবাযত্ন করাই ছিল তাদের ধর্মের অঙ্গ। তাই, এই দীর্ঘ ভ্রমণে শুধু হিমালয়ের প্রাকৃতিক শোভা উপভোগই নয়, হিমালয়বাসীদের সঙ্গে আন্তরিক ও অবাধ মেলামেশার সুযোগও হত। এছাড়া, এ-পথে খোলা জায়গাতে জিনিসপত্র ছড়িয়ে ফেলে রাখলেও চুরির আশঙ্কা মনে স্থান পেত না। পাহাড়িরা ছিল এমনি সৎ। ভ্রমণের পথে এমন নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনোভাব হত সেকালে যাত্রীজীবনের পরম সম্পদ।

তবে পথের অসুবিধা ও বিপত্তিও ছিল যথেষ্ট। যাত্রীদের থাকবার অন্য কোনও ব্যবস্থা ছিল না। চটিগুলিতেও পথের পাশে

দোকানে অসংখ্য মাছির উৎপাত। চটিতে দুপুরে বসতে, শুতে, খেতে—সব সময়েই লক্ষ লক্ষ মাছির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা ছিল মহা বিরক্তিকর সমস্যা। আর এক বিপত্তি, পায়খানার অব্যবস্থা। চটি থেকে কিছু দূরে চটে-ঘেরা সাময়িক পায়খানার একটা ব্যবস্থা থাকলেও পথশ্রান্ত যাত্রীরা অনেকেই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সন্ধ্যায় বা অতি ভোরে উঠে চটিগুলির সামনে পথের উপরই কাজ সারত, সেই সব এড়িয়ে ভোরে পথ চলতে গা ঘিনঘিন করে উঠত। এই সকল কারণে সেকালে এপথে কলেরার প্রকোপও দেখা দিত। তাই, পরে প্রত্যেক যাত্রীরই কলেরা ইন্‌জেক্‌শন নেওয়ার বিধান চালু হয়। সে নিয়ম এখনও আছে।

অথচ, এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও অসুবিধা সত্ত্বেও হিমালয়ের দুর্নিবার আকর্ষণে ওই পথে আমার বারবার ফিরে যাওয়া। শুধু গাড়োয়ালেই নয়, হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলেও। হিমালয়-ভ্রমণে এইভাবেই আমার 'সেকাল' এসে 'একালে' মেশে। চোখের উপর দেখি, ঐ-অঞ্চলে ভ্রমণ কেমনভাবে নবরূপ পায়।

এবার, ১৯৮০ সনে আমার কেদার-বদরী যাত্রার কথা বলি।

একালে বদরীনাথ পর্যন্ত বাসপথ চলে গেছে। হাঁটার আর প্রশ্ন ওঠে না। কেদারনাথের পথেও গৌরীকুণ্ড—অর্থাৎ ন' মাইল আগে পর্যন্ত বাস যাচ্ছে। তাই ও-পথে ওই বাকি পথটুকু হাঁটা। তাও এখন অনেকেই হাঁটেন না। ঘোড়ায় চড়েন। কেদার বদরী যাত্রা এখন, ইচ্ছা করলে, এক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করা যায়। কেদারনাথ, বদরীনাথে, গৌরীকুণ্ডে যাত্রীনিবাস ও 'টুরিস্ট লজ্‌'-এর প্রশস্ত, এমন কি কোথাও কোথাও আরামপ্রদ ব্যবস্থাও হয়েছে। এই সূত্রে মনে পড়ে, এই বছরেই আমার এক সুহৃদ স্বামীজি খবর দিলেন, তাঁদের আশ্রমের উদ্যোগে বদরীনাথে নতুন ধর্মশালা খোলা হয়েছে। সাদরে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন, "সেখানে 'ডানলোপিলো' শয্যারও ব্যবস্থা হয়েছে। এবার গেলে আমাদের ওখানে উঠবেন যেন।" কথাগুলি শুনে হাসি পায়, ভাবি, ওই লোভেই কি আমার ভ্রমণে বার হওয়া। আবার তখনই মনে হয়, একালে যাঁরা ওতে খুশি হন, তাঁরা ওই সুখসুবিধা আরাম ভোগ করুন, ক্ষতি কী! যাতায়াতের ও থাকার এইভাবে বহুবিধ আয়োজন হওয়ায় এখন ওই

পথে ভ্রমণকারীর সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে। তা ছাড়া ভ্রমণ সংস্থাগুলিও একালে যাত্রীদের যাতায়াত, থাকা, খাওয়া সবরকম ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়ে ঘুরিয়ে আনছেন,—শুধু হিমালয়েই নয়, ভারতের দিকে দিকে, বাঁধাধরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। তাতে অবশ্য কারও কোনও স্থান ভাল লাগলেও ইচ্ছা মতো একদিন বেশি থাকার উপায় থাকে না। তবুও, একালে বহুসংখ্যক লোকের ভ্রমণের ইচ্ছা মেটাতে এইভাবে অনেক সুবিধা হয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু, এর এক বিপরীত দিকও আছে। ওই কেদার-বদরীর পথই ধরা যাক। সেকালের পথ-চলার সেই আনন্দ ও বহুমুখী অভিজ্ঞতালাভ একালে আর সম্ভব নয়। প্রকৃতির সঙ্গে শান্ত মনে মিলনেরও সুযোগ থাকে না। সেকালের পথের অসুবিধা ও বিপত্তি একালে দূরীভূত হলেও নতুন বিপত্তিরও সৃষ্টি হয়। এখন গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে বহু সবল সুস্থ সমর্থ যাত্রী ওই হাঁটাপথটুকু ঘোড়ায় যাতায়াত করেন। হিমালয়ে পথ-হাঁটার অনভ্যাস ও অভিজ্ঞতার অভাব, পথের দুর্গমতার অহেতুক ভয়ভাবনাও হয়তো, এর কারণ। কিন্তু এত বেশি ঘোড়া চলাচলের ফলে কাদায় ও পশুগুলির নাদে হিমালয়ের সেই মনোরম পথ অতীব পিচ্ছিল ও নোংরা হয়, পদযাত্রীর স্বচ্ছন্দ গতির বিঘ্ন ঘটায়, হিমালয়-ভ্রমণের আনন্দ হরণ করে। এ-পথে এত ভিড়ও আমার ভাল লাগে না। বিশেষ করে সেবার বদরীনাথে পৌঁছে প্রাণ যেন হাঁফিয়ে ওঠে। সেখানে এখন রীতিমতো শহর। দলে দলে যাত্রী আসে। বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সমাবেশও দেখি। মনে মনে ভাবি, এখানে আর আসা নয়। আমার সেকালের কেদার-বদরী ভ্রমণের সব আনন্দ একালের এত ব্যবস্থা সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও আধুনিক শহর সভ্যতার অনুপ্রবেশে হারিয়ে গেছে। কিন্তু, জানি, এ-হারানোর ক্ষতি শুধু সেকালের যাত্রী—আমারই, একালের যাত্রীদের নয়। তাঁরা তাঁদের মনোমত আনন্দ ও তৃপ্তি নিয়ে ফিরে চলেন, সন্দেহ নেই।

ভ্রমণের সেকাল একালের এই প্রভেদের যথেষ্ট কারণও থাকে। শুধু হিমালয় ভ্রমণে নয়, ভারতের অন্যত্রও। নানা কারণে একালে মানুষ সময়ের দাস। অল্প সময়ে অনেক কিছুই দেখার তার আকাঙ্ক্ষা। তার সুবিধাও হয়েছে। একাল হল দ্রুতগতির যুগ। স্থান থেকে স্থানান্তরের দূরত্ব যেন কমে গেছে। দেশের দিকে দিকে মোটর পথ

ছড়িয়ে পড়েছে। টুরিস্ট আবাসের ব্যবস্থা হচ্ছে। ট্রেনে, বাসে, মোটরে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রীরা ছুটে চলেছে। এক যাত্রায় ক'দিনের মধ্যেই ভারতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে কত বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান দেখে ঘুরে আসা তাদের লক্ষ্য। হয়তো, কয়েক ঘণ্টায় খাজুরাহো দেখা, অজন্তায়, বড় জোর, একটা দিন কাটানো। এ'রাই হলেন একালের বেশিসংখ্যক ভ্রমণকারী। সেকালের মনোভাব নিয়ে এখন কেউ ধীরে সুস্থে ভ্রমণ করেন না, এমন নয়। তাঁরাও আছেন। তবে সংখ্যায় কম। সাধারণত একালের ভ্রমণ কেমন, তারই এক ঘটনা বলি।

সেবার তখন পন্ডিচেরিতে রয়েছি। ভোরে বাসার নিকটে সমুদ্রের ধারে পায়চারি করছি। হঠাৎ এক তরুণ বন্ধুকে দেখে আশ্চর্য হই,—"আরে! তুমি কোথা থেকে? আসবে, আগে খবর দাওনি তো? চল,—আমার ডেরায়, এই তো নিকটেই। থাকার ব্যবস্থা ওখানেই হয়ে যাবে।" সে ম্লানমুখে জানায় "আমার যে আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরতে হবে।" তারপর তার আসার বিবরণ শুনি। দুর্গাপুর থেকে বাসে যাত্রা করে একদল চলেছে—দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে। সেই দলে তার ক'জন আত্মীয় আছেন, তাঁদেরই বিশেষ পীড়াপীড়িতে এরও আসা। গতকাল সন্ধ্যার পর এখানে পেঁছেছে। রাত্রে আমার বাসার সন্ধান পায়নি। এখন জানতে পেরে চলে এসেছে। আধঘণ্টার মধ্যেই তাকে আবার বাসে উঠতে হবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পন্ডিচেরির "যতটুকু পারা যায়" দেখে বাস ছুটবে মাদুরা অভিমুখে। এইভাবেই কদিনের মধ্যে কুমারিকা পর্যন্ত গিয়ে তাদের ফেরবার পথ ধরা। মুগ্ধনেত্রে সে সমুদ্রের দিকে তাকায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনুশোচনা জানায়, "এভাবে কি ভ্রমণ হয়। কোথাও কিছু মনপ্রাণ দিয়ে দেখা হচ্ছে না, শুধু বাসে বসে ছোটা আর এক এক জায়গায় নেমে বুড়ি ছোঁওয়া। বাধ্য হয়ে আসতে হল। ভাল লাগছে না মোটেই।"

জানি, তার এ-ভ্রমণ ভাল না-লাগারই কথা। হিমালয়ের পথে পথে সেকালের মতো ঘুরে সে আনন্দ পায়। সে জানে "পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,/ পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়॥'

সেকালে বাঙালীদের বাঙলার বাইরে ভ্রমণকালে এক পরম আনন্দময় আশ্রয়-স্হান একালে হারিয়ে গেছে। "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" সে-

কালেও সর্বত্র ছিলেন, একালেও আছেন। কিন্তু, সেকালের প্রবাসীরা অনেকেই ছিলেন উদারমতি, অতিথিবৎসল। তাঁদের শহরে অপরিচিত বাঙালি ঘুরতে এলে তাঁরা যেচে সাগ্রহে ডেকে নিয়ে যেতেন ; আশ্রয় দিতেন নিজের বাড়িতে। এইভাবে নিঃস্বার্থ অতিথিসেবায় তাঁদের ছিল বিপুল আগ্রহ। এরই এক উদাহরণ দিই।

বছর পঞ্চাশ আগেকার ঘটনা। হঠাৎ কাশী থেকে চিত্রকূট ভ্রমণে রওনা হই। সঙ্গে মা ও এক ভাইঝিও চলেন। অথচ, আগে থেকে কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। শুনেছি, চিত্রকূট স্টেশনে নামলে যানবাহন পাওয়ার অসুবিধা, তাই মানিকপুর স্টেশনে নামাই সুবিধাজনক। ট্রেন থেকে সেইমতো নামাও হয়। চিত্রকূটের বাসে উঠে বসি। অপরিচিত এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে একটা খামে-ভরা চিঠি আমাকে দেন, বলেন, 'নিন, আপনার চিঠি।'—'আমার চিঠি!' অবাক হই। এখানে আমাকে চিনবে কে? দেখি, খামের ওপর লেখা আমার নাম নয়। অপর এক-জনের। তবে বাঙালীর নাম। খাম ফেরত দিয়ে বলি, "এ চিঠি আমার নয়।" লোকটি বাসের অপর যাত্রীদের দিকে তাকায়। দেখে, আর কেউ বাঙালি নেই। আমাকে বলে, 'কোথায় চলেছেন? চিত্রকূটে? ডাক্তারবাবুর ওখানে উঠবেন তো?' 'ডাক্তারবাবু?' আশ্চর্য হয়ে তাকে প্রশ্ন করি। বলি. 'তিনি কে? সেখানে উঠব কেন? ধর্মশালা আছে নিশ্চয়? সেখানে উঠব।' লোকটি অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়, বলে, 'চিত্রকূট চলেছেন, আর ডাক্তারবাবুকে চেনেন না? এখানে এলে সব বাঙালি তো তাঁরই কাছে ওঠেন। আমি তাঁরই লোক। পড়ুন না চিঠিটা।'—খামের মুখ খোলা, তবুও তো পরের চিঠি। পড়ব কেন? সে শোনে না। নিজেই চিঠিটা বার করে হাতে দেয়। পড়ি। চিঠির মাথায় ছাপা হরফে ডাক্তারবাবুর নাম দেখি, পি মুখার্জী। বাংলায় লেখা চিঠি, "আমার লোক যাচ্ছে, এর সঙ্গে চলে আসবেন।" কিন্তু, যাকে লেখা তার দেখা নেই। তবু লোকটির বিশ্বাস, এ যে বাঙালি সব-যাত্রীকেই সাদর আমন্ত্রণ। আমাকেও তাই না-ছোড়-বান্দা হয়ে ধরে।

চিত্রকূটে পেঁছিই। বাস-স্ট্যান্ডের নিকটেই ধর্মশালা। লোকটি আমাদের সেখানে যেতে দেয় না। বলে, ওই তো ডাক্তারবাবুর

বাড়ি চলুন। সেখানে না থাকতে চান, ফিরে এসে ধর্মশালায় উঠবেন।

অপরের বাড়িতে বিশেষ করে তীর্থক্ষেত্রে আতিথ্যগ্রহণে মার স্বভাবতই সম্পূর্ণ অমত। আমার কিন্তু ইচ্ছা, একবার দেখেই আসি না প্রবাসী বাঙালি ডাক্তার, সেখানে যাত্রীদের থাকার কিরকমই বা ব্যবস্থা। বিরাট এক বট গাছের ছায়াতলে মা'দের বসিয়ে রেখে চলে যাই, বলি, এক্ষুনি ঘুরে আসছি।

ডাক্তারবাবুর একতলা বড় বাড়ি। প্রকাণ্ড একটা হলে লোকজনের আনাগোনা। সেখানে একপ্রান্তে চেয়ার টেবিল। ডাক্তারবাবু রোগী দেখতে ব্যস্ত। থমকে দাঁড়াই, ভাবি, ফিরে চলি। এমনি সময়ে একজন আমাকে দেখেই এগিয়ে আসেন। বলেন, "আরে! উমাপ্রসাদবাবু! আপনি এখানে! কখন এলেন? দাঁড়িয়ে কেন? ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরিচয় নেই?" তাঁকে সব ঘটনা জানাই। তিনি তখনই আমাকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তারবাবুর টেবিলের সম্মুখে দাঁড়ান, আমার পরিচয় দেন, মা সঙ্গে এসেছেন জানান,—কথাগুলি বলেন, বেশ একটু চেঁচিয়েই। বুঝতে পারি, ডাক্তারবাবু কানে কিছু কম শোনেন। কিন্তু তখনি আচম্বিতে আর এক দৃশ্য দেখি। পাশেই একটা দরজা খুলে যায়। দ্বারমুখে বিদ্যুৎচমকের মতো আবির্ভাব হন এক বঙ্গমহিলা, পরনে লালপেড়ে শাড়ি, সিঁথিভরা টকটকে সিঁদুর। আমার দিকে তাকিয়ে যেন ভর্ৎসনার সুরে বলেন, আমার মা এসেছেন! আর তাঁকে গাছতলায় বসিয়ে রেখে আপনি চলে এসেছেন এখানে? আসুন আমার সঙ্গে— আর দ্বিতীয় কথাবার্তা নেই। তখনই দ্রুতগতিতে চলেন আমার মায়ের কাছে। এসেই তাঁর পায়ে প্রণাম করে যেন অভিমানের সুরেই বলেন, মা, এ কী? আপনার মেয়ে এখানে, আর আপনি এসে গাছতলায় বসে! চলুন এখনি—আপনার মেয়ের বাড়িতে।—মা-কেও তাই যেতেও হয়।

তারপরের ঘটনাবলীর বিবরণ এখন থাক। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আদরযত্নের মধ্যে শুধু আমরাই থাকি না। তাঁর আন্তরিক অনুরোধে কাশীতে টেলিগ্রাম পাঠাতে হয়। দাদারাও সবাইকে নিয়ে এসে যোগ দেন। চিত্রকূটের সেই আনন্দমুখর ভ্রমণের দিনগুলির মধুর স্মৃতি কখনও ভোলবার নয়।

সেকালে ভ্রমণে এই ধরনের আদর আপ্যায়ন লাভের উদাহরণ আরও আছে।

এযুগের নানান জটিল সমস্যার নিষ্পেষণে প্রবাসী বাঙালির আতিথেয়তার সেই উদার মনোভাব অবলুপ্ত হয়েছে। একালে অবশ্য এখন সর্বত্রই ভাল ভাল হোটেল ও টুরিস্ট লজ, সেখানে থ্যাকা একালের ভ্রমণের আনন্দ লাভ।
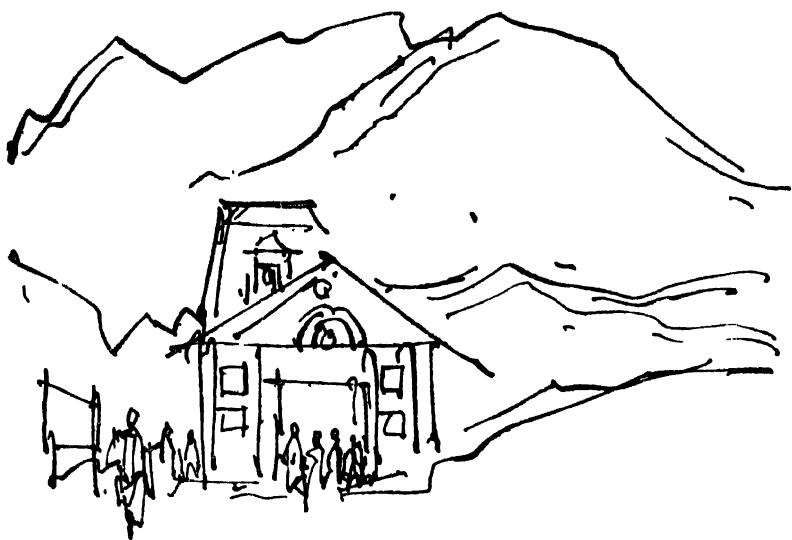
অভিযাত্রী

সেবার পাহাড় থেকে নেমে ক'দিনের জন্য কলকাতায় এসেছি। দুপুর বেলা। উপরে এসে বাড়ির পরিচারক জানাল, নিচে একজন দেখা করতে এসেছেন। তাড়াতাড়ি নেমে চলি। ভাবি, এই দুপুরে কে এলেন ? কলকাতার বন্ধুরা তো এসময়ে সবাই কাজে বার হয়েছেন। নিশ্চয় সুশীল হবে। হিমালয় প্রেমিক গ্রামের ছেলে। আমার আসার খবর পেলেই চলে আসে দেখা করতে সেই সুদূর গ্রাম থেকে। এই স্থির বিশ্বাস নিয়ে হাসি মুখে নিচের ঘরে এসে ঢুকি। আর তখনি মুখের হাসি মিলায়-চমকে উঠি! কোথায় সুশীল!—চেয়ারে জাঁকিয়ে বসে এক অপরিচিতা প্রৌঢ়া ভদ্র মহিলা! গৃহস্থ বাড়ির ভারিক্কি গৃহিনীর চেহারা, বেশভূষাও। মাথায় চওড়া করে সিঁদুর, কপালে রক্তচন্দনের মস্ত ফোঁটা।

'মহিলা' দেখেই প্রথমে মনে হয়েছিল, হিমালয়ের কোন তীর্থ পথের খবর নিতে এসেছেন, কিন্তু তখনি আবার ভাবি, 'সধবা মহিলা', স্বামীকে পাঠালেই তো পারতেন।

তাঁর সুমুখে এগিয়ে দাঁড়াতেই তিনি চেয়ারে বসেই আমার মুখের

দিকে তাকান, গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করেন, আপনি কী উমাপ্রসাদবাবু ?

বিনীত ভাবেই জানাই, হ্যাঁ।

তখনি যেন অনুযোগের সুরে তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন, আপনি 'শেরপাদের দেশে' বই লিখেছেন ?

আমারও এবার দ্বিতীয় চমক ! ঐ বই-এর কথা এই মহিলার মুখে কেন ? ওটা তো হিমালয়ের কোন তীর্থপথই নয় ! উত্তর দিই, হ্যাঁ, ঐ নামে একটা বই আমার আছে বটে।

এবার আর প্রচ্ছন্ন অভিযোগ নয়। কঠোর কণ্ঠে ধমকের সুরেই বলে ওঠেন, ও-সব বই লেখেন কেন ?

এইবার আমার আর চমক নয়, বেশ কৌতুক জাগে। একটা চেয়ার টেনে বসি। যেন অনুতপ্ত কণ্ঠে তখনি স্বীকার করি খুবই অন্যায় করে ফেলেছি। আপনি ও-বই পড়তে গেলেন কেন ?

তিনি তখনি বলেন, আমি ! আমি পড়তে যাব কেন ? আমার ছেলে পড়েছে আর পড়তে পড়তে কেবলি আমাকে বলে মা, শোনো, এখানটা পড়ে শোনাই, হিমালয়ের কী সব সুন্দর জায়গা ! তারপর ইদানীং বলতে শুরু করেছে, মা, আমি এবার যাবই ঐদিকে ঘুরতে। শুধু তাই ? আপনি বুঝি একাই গিয়েছিলেন ? সেও ধরেছে, একাই যাবে হিমালয়ের ঐ ভয়ানক জায়গায় ! দেখুন দিকি, আপনার জন্যেই আমার এখন এই মহাবিপদ ! আর গেছেন-গেছেন, এ সব বই লিখতে যান কেন ?

আমি সহানুভূতি দেখিয়ে বলি, তাই তো ! এমন কাণ্ড ঘটবে, বুঝতে পারিনি। আপনার ছেলেটি কত বড় ?

তিনি বলেন, তা তার বয়েস, এই ২৬ বছর হল। একটা ফ্যাক্টরীতে চাকরি করে। আর কাজ থেকে বাড়ি ফিরে এসে ঐসব বই পড়ে সময় কাটায়, বছরে এক একবার লম্বা ছুটি নিয়ে ঘুরতে চলে যায় ঐ পাহাড়েই।

পাহাড় শুনে আমি আশ্বস্ত হই, বলি, পাহাড়ে সে ঘোরে তাহলে? কোথায় কোথায় গেছে ?

মহিলার এতক্ষণে কথার সুর বদল হয়, ছেলের গরব করে বলেন, তা গেছে অনেক জায়গায়, – সেই কেদার বদরী, গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী- আরও সব কোথায়,—দুবার তো গেল দার্জিলিং-এ,—ওখানকার কী

ছাই ট্রেনিং ফেনিং আছে, তাই করে এল।

বুঝলাম, মাউনটেনিয়ারিং ট্রেনিং পাওয়া ছেলে। আনন্দ প্রকাশ করে বলি, বাঃ! আপনার ছেলেটি তো দেখছি খুব ভাল ছেলে। ভাগ্যবতী মা আপনি। কোথায় থাকেন আপনারা?

তিনি এইবার শান্ত হয়ে ধাতস্থ হন। জমিয়ে গল্প করতে বসার মত বলেন, তা থাকি এখান থেকে বেশ দূরেই—হাওড়ার সেই এক প্রান্তে। এসেছিলাম এই কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে। আপনার ঠিকানাটা কোন রকমে জোগাড় করেছিলাম। ক'দিন আগে। দর্শন করে ফেরবার পথে ভাবলাম এই অঞ্চলেই বাড়িটা কোথাও হবে, খোঁজ করে যাই একবার, দেখা করে বলে আসি, কি বিপদেই ফেলেছেন! কেন এ-সব লিখতে যান, দেখুন দিকি, আমার এখন কী দুর্ভাবনা,—ছেলে বলছে যাবেই এবং একাই!

আমি কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তা' আপনি সেই হাওড়ার এক-প্রান্ত থেকে এতোদূরে কালীঘাটে এলেন, কাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন? আপনার স্বামী কী করেন?

এবার ছেলের নয়, নিজের গর্বে মাথা দুলিয়ে বলেন, এলাম আমি একাই। আমি একাই তো ঘুরে বেড়াই, কতো জায়গায় গিয়েছি-এ কালীঘাট আর কী দূর? সেই কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার—সবই আমার ঘুরে আসা। কর্তার কথা জিজ্ঞাসা করছেন? এক অফিসের বড়বাবু তিনি। অফিসের কাজ নিয়েই আছেন, বাড়ির কাজের মধ্যে শুধু বাজারটা করে আনা। না হলে, সারাক্ষণ বাড়ি বসে থাকা বা ঘুম। কোথাও যেতেই চান না।

আমি এইবার হেসে বলি, তা হলে বলুন, ছেলেটি হয়েছে তার মায়েরই মতন! কিন্তু, আপনাকে এখন আমার মনে একটা ভয় ও দুর্ভাবনার কথা বলি। আমি সেই থেকে ভাবছি, আপনি এই কলকাতা শহরের ভয়াবহ ও ভীষণ রাস্তা দিয়ে একা সেই হাওড়ায় ফিরবেন কী করে! (সে সময়ে বিশেষতঃ ভবানীপুরে পাতাল রেলের জন্য রাস্তা খোঁড়া,-বিরাট খানাখন্দ!) –আপনাকে জানাই, হিমালয়ের কোথাও এমন দুর্গম ও বিপদের পথ দেখিনি। এখানে বাড়িতে ছেলেমেয়েরা সময় মত না ফিরলে, বাপমার কী মহা দুর্ভাবনা, ভাবেন, ভালয় ভালয় ঘরে ফিরলে বাঁচি। এই শহরের পথের মত এতো ভয়ের পথ হিমালয়ে নেই, সেখানে

এত ঘন ঘন দুর্ঘটনার কথাও শোনা যায় না।

ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে আমার মুখপানে তাকিয়ে শোনেন। তাঁর মুখে খুশির আলো ফোটে, কোমল কণ্ঠে বলেন, আপনার কথাগুলো মনে ভারি তৃপ্তি দিল। ভাবনাও গেল। ছেলেকে একবার পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে? তারা অবশ্য কেউই জানে না, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

আমি বলি, ছেলে যদি আসতে চায়, অবশ্যই আসতে পারে। তার সঙ্গে আলাপ করে আমিও আনন্দ পাব। কিন্তু, মায়ের প্রাণ,—যাবার সময় আবার বলে যান, আপনি যেন তাকে বলবেন, সঙ্গে কেউ যেন যায়।

ছেলেটি তারপর এসেছিল। চমৎকার ছেলে। হবারই কথা। হিমালয়ে যারা এইভাবে ঘোরে, তাদের জাতই আলাদা।

পাগলীর পায়স

পাগলীর পায়স,—একখানি বই-এর নাম। নামের পাশে বিশদ বিবরণ দেওয়া—"কেদার বদরিকার দৈববাণী"। "পাগলীমা প্রণীত"। প্রকাশকের নাম,—চপলাবালা ঘোষ। ঠিকানা—১৬-২৮নং মান-মন্দির ঘাট, কাশীধাম। মূল্য ২৲ টাকা।

বইখানি পড়ে মনে হয়, সম্ভবতঃ প্রকাশিকাই লেখিকা। তাঁর "বাসা"—"পাতালেশ্বর ১৫১নং প্রতাপ ঘোষের বাড়ি কাশীধাম"।

অনেকদিন আগে এক বন্ধু বইটি আমাকে পড়তে দেন। চটি বই। অতি সাধারণ কাগজে, সাধারণ ভাবে ছাপা। কিন্তু বইটি পড়ে আশাতীত আনন্দ পাই। বন্ধুকে তাঁর বই ফেরত দিয়ে ভাবি,

কাশীতে খোঁজ করে এক কপি কিনে রাখব। কিন্তু বাঙালীটোলার পুরানো বই-এর দোকানে-দোকানে খোঁজ করেও যোগাড় করতে পারি নি। তবে, ঐ "পাগলী মা"র লেখা অপর একখানি বই পাই—প্রায় একই রকম দেখতে। নামও "পাগলীর পায়স"—কিন্তু, সেটির বিশদ বিবরণ—"তারকেশ্বরের দৈববাণী"।

এই থেকে বোঝা যায়, কাশীবাসিনী সেই মহিলা সাহিত্যচর্চা করতেন ও সুলেখিকাও ছিলেন।

আমার নিজের প্রথম কেদারবদরী যাত্রা ১৯২৮ সালে। আজ ষাট্ বছর হয়ে গেল। আর, সেই মহিলার যাত্রা আমার যাত্রার আরও বছর ছয় আগে –১৩২৯ অর্থাৎ ১৯২২-এ।

ঝর্ঝরে সহজ ভাষায় লেখা সেই মহিলার নিখুঁত যাত্রাবিবরণী আমার চোখে তাই জীবন্ত ছবির মতই ফুটে ওঠে।

আমার ধারণা, "পাগলীর পায়স"-এর স্বাদ গ্রহণের হয়ত অনেকেরই সুযোগ হয় নি। অনেক দিন আগে পড়া সেই বইখানিতে বর্ণিত যাত্রা-কাহিনী আমার এখনও যেমন ও যতটুকু স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে, পাঠকদের এখানে পরিবেশন করি।

বাসি পায়সেরও চমৎকার স্বাদ থাকে!

১৩২৯ সালে কাশীবাসিনী সেই লেখিকা কেদারবদরী তীর্থযাত্রা করার "স্বপ্নাদেশ" পান্। কিন্তু, যাত্রার খরচার টাকা পাবেন কোথায়? দেশে আত্মীয়স্বজনের কাছে কাপড় ও টাকার সাহায্য চেয়ে চিঠি লেখেন।

অনেকেরই জবাব আসে, কিন্তু টাকা কাপড় কিছুই আসে না। জবাবে,—নানারকমের কৈফিয়ত। কেউ লেখেন, বাড়িতে অসুখবিসুখ, ডাক্তারের খরচা হচ্ছে অনেক, কারও মেয়ের বিয়েতে প্রচুর খরচ হয়েছে ইত্যাদি।

লেখিকা চিঠিগুলি উল্লেখ করে মন্তব্য লেখেন,—পাঠালে পাঠাতিস্ তো দু টাকা, বা বড় জোর পাঁচ টাকা! তাই না পাঠানোর অতো অজুহাত! একজন তো চিঠির জবাবই দিল না,—দেখা হলে বলবে, কই! চিঠি তো পাই নি! –মোক্তারি করে তো!

অতো চেয়েও কিছুই পান্ না। পাবেন কী করে? ছোট-বেলাতেই যে মায়ের অভিশাপ আছে! বালবিধবা মেয়ে। মায়ের কাছে থাকেন। সেকালের কঠোর নিয়ম মেনে থাকা, খাওয়াদাওয়া,

একাদশীতে নিরম্বু উপবাস। স্নেহময়ী জননী তারই মধ্যে বিধবা মেয়েকে বেশি করে ও ভালভাবে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। দুধ, সর, মিষ্টি আনেন। আদর করে খাওয়াতে বসেন। বিধবা বালিকা অনাদরে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকে, কোনমতেই খায় না। মা পীড়াপীড়ি করেন। মেয়ে তবু শোনে না। মায়ের চোখে জল ঝরে। অবশেষে বলে ওঠেন, "না খেয়ে আমাকে এখন কষ্ট দিচ্ছিস্, আমি মরে গেলে তখন কারও কাছে চাইলেও পাবি না!"

মেয়েও জবাব দিতে ছাড়ে না। মুখ ঘুরিয়ে বলে, "মা আমার অমর। সব সময়েই সঙ্গে থাকবেন, না চাইলেও সেধে খাওয়াবে মা!"

প্রথম প্রথম মা কাঁদতে কাঁদতে খাবার নিয়ে চলে যেতেন। আবার তখনই ফিরেও আসতেন। মেয়ে তখন তাঁর অভিশাপের কথা তুললে মা বলতেন, তুই তো এখন চাস্ নি,—"চাইলে পাবি না" বলেছি। দেখিস্, তুই না চাইলেও পাবি।

মেয়ে তখন চোখে-জল, মুখে-হাসি নিয়ে খেয়েছে।

মায়ের সেই অভিশাপ ও আশীর্বাদ দুই নিয়ে সেই কন্যাই পরে কাশীবাসিনী। এখন স্বপ্নাদেশ পেয়ে কেদারবদরী যাত্রার অভিলাষিণী।

তাই কাপড় টাকার সাহায্য চেয়েও কিছুই না পেয়ে দমেন না। ভাবেন, ঠিকই তো, পাব কেন? চেয়েছি যে! কাপড় নেই! তা আমার আবার লজ্জা কীসের? বিবসনা মায়েরই যখন পূজা করি!

যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। জানেন, "কাশীবাসী যাত্রীদের সঙ্গে চলবে না। সকলের টাকার খুঁটি, আমার নামের বল!"

১৬ই চৈত্র যাত্রা করেন। সঙ্গে—১৸৵০। ঝুলিতে—/১ গুড়, /১ ছাতু, একটা তেঁতুল, একটা ঘটি, পেতলের কড়া, পূজার শিবঝুলি, গীতা চণ্ডী, পূজার সামগ্রী।

এই সম্বল করে তাঁর কেদারবদরী যাত্রা!

হরিদ্বার পৌঁছুলেন। সেকালে বাঙালী কেদারবদরী যাত্রী অনেকেই ভোলাগিরির আশ্রমে উঠতেন। স্বামিজীর তখনও শরীর আছে। তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করে যাত্রীরা যাত্রা শুরু করতেন। ১৯২৮ সালে আমরাও তাই করেছিলাম। মনে আছে, তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, পাহাড়ে পথ চলতে (তখন হৃষীকেশ থেকে পায়ে-হাঁটা পথ) ক্লান্তিবোধ হলে এই মন্ত্রটি স্মরণ করবে, ক্লান্তি দূর হবে।

আধবদরী যোগবদরী ধ্যানবদরী নৃসিংহবদরী কেদারবদরী।
পঞ্চবদরী স্মরেৎ নিত্যং পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

লেখিকাও অন্য যাত্রীদের সঙ্গে স্বামিজীর দর্শনে যান্।

স্বামিজী কথাপ্রসঙ্গে যাত্রীদের প্রশ্ন করেন, কে কতো টাকা সঙ্গে নিয়েছ ?

কেউ জানায়, তিনশ', কেউ দু'শ, কেউ একশ',—এই ভাবে চল্লিশ টাকা পর্যন্ত নামে।

বেশী টাকাওয়ালাদের স্বামিজী বলেন, পথে যাত্রীদের কেউ খেতে না পেলে খেতে দেবে। বৈকুণ্ঠের পথে দয়াই হ'ল ধর্ম।

লেখিকা চুপচাপ বসে। স্বামিজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তুই কেত্তা রুপিয়া লিয়া বোল মেরে। তিনি উত্তর দেন, পরমাত্মা মজুত।

স্বামিজীর মুখে হাসি ফোটে, বলেন, টাকাওয়ালা আপ্ আপ্ খায়ে খায়ে হাগ্ হাগ্ আয়েগী। তুই হালুয়া পুরী লাড্ডু খায়ে এত্তা গোদ্ মোটা হোগী !

স্বামিজীর কথা শুনে লেখিকা মনে ভাবেন, স্বামিজী তাঁকে ঠাট্টা করলেন। মনে ব্যথা পান্।

কিন্তু, যাত্রাশেষে স্বামিজীর কথামতই যে ঘটবে, তা তখন ভাবতে পারেন না।

তারপর, অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে লেখিকার যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু, কালীকমলীর ধর্মশালার সদাব্রতের চিঠি পান্ না, অক্ষয়তৃতীয়ায় সে চিঠি বিলি হয়। লেখেন, "নারায়ণের নাম সঙ্গে আছে, ধনরত্ন নেই, কিন্তু আনন্দের অবধি নেই।"

পথে ভিক্ষার চেষ্টা করেন। লেখেন, "চাইতে জানি না। মিষ্টি মুখ নেই, অহংকার আছে, কেউ সামান্য কিছু দিতে এলে নিতে মন ওঠে না।"

তবু, খাবার জোটে। সঙ্গীরা কেউ কখনো ভাগ দেয়, না নিলে স্নেহের ভর্ৎসনা করে।

পথে চটিতে শুয়ে বারে বারে নানা স্বপ্ন দেখেন। অদ্ভুত অসম্ভব ঘটনার স্বপ্ন। অথচ, জেগে উঠলে সেই স্বপ্নই সফল হয় আশ্চর্যভাবে।

তারই অনেক ঘটনা লেখেন। দু একটা যা মনে আছে, বলি।

দেবপ্রয়াগে। স্বপ্নে দেখেছেন, মা এসেছেন, খাবার হাতে, বলছেন, কেন রাগ করিস্? চেয়ে খেতে পারিস্ না? সময় পাই না, তাই এসে দিতে পারি না। এই নে,—খা'। —একটা দোয়ানিও নে।

ঘুম ভেঙে যায়। দেখেন, কাশীবাসিনী এক সহযাত্রী অনুরোধ করছেন খাবার জন্যে। তারপর ডেকে নিয়ে হাতে দেন একটা দোয়ানিও!

অথচ, জানেন সেই যাত্রীরও যাত্রা মাত্র ৩৫্ টাকা সঙ্গে নিয়ে!

আর এক চটিতে। আবার স্বপ্ন। মা এসেছেন একবাটি পায়েস হাতে। বলছেন, আয়, পায়েস এনেছি, খেয়ে নে!

জেগে ওঠেন। মায়ের ওপর অভিমান হয়, স্বপ্নে এসে পায়েস খাওয়াচ্ছেন!

কিছু পরে। চটির অপরদিকে এক ধনী যাত্রীদল এসে ওঠে। রান্নাবান্না করে খাওয়াদাওয়াও হয়। তাঁদের এক মহিলা লেখিকার দিকে তাকিয়ে বলেন, কই গো! তুমি তো উনুনও জ্বলালে না, রান্না করলে না, খাবে কী? চলে এস এদিকে, নিয়ে যাও—এটা।

ডেকে খেতে দেন্—খাবার ও একবাটি পায়সও!

লেখিকার চোখে জল নামে! মায়ের এ কী করুণা!

দিনের পর দিন পাহাড়ের সেই দুর্গম পথে চলতে চলতে পাথরে চোট লেগে লেখিকার পায়ে ভীষণ ব্যথা। চলতে পারেন না। ওদিকে আবার নিজের ঝোলার ভারও আছে। মনে মনে বাবা কেদারনাথকে গালি দিচ্ছেন। হঠাৎ গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী আসেন, তাঁর বোঝা নিজে বয়ে নিয়ে তাঁকে চটিতে পেঁছে দিয়ে চলে যান্।

চটিতে তাঁর পায়ের ব্যথার যন্ত্রণা বাড়ে। প্রবল জ্বর দেখা দেয়। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকেন। কাশীবাসিনী যাত্রীরা দুদিন অপেক্ষা করে তাঁকে সেই অবস্থায় ফেলে রেখে যাত্রাপথে এগিয়ে যান্।

ওদিকে লেখিকা জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখেন, কে যেন এসেছেন তাঁকে নিয়ে যেতে কাণ্ডি করে!

ঘটেও অবশেষে তাই।

গোরখনাথের এক শিষ্য সাধু চটিতে পেঁছান। তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে তাঁর সেবা করেন। বলেন, ফুংক্ দিয়া তুমরা দরদ,

চলো তুম্ কাণ্ডিমে,—হাম্ লেনে আয়া।

প্রকৃতই তাঁর ব্যথা কমে যায়। পরদিন কাণ্ডিতেও উঠতে হয় না। পায়ে হেঁটেই চলেন। সাধু বলেন আমার সব জানা আছে তোমার কাছে খানা নেই, আমি খানা দেব—না খেলে মার দেব—গোসা করব। –তিনি তাঁকে এইভাবে একদিন সঙ্গে থেকে খাইয়েদাইয়ে চলে গেলেন।

লেখিকা মন্তব্য করেন, "প্রহ্লাদের পিতৃবৈরী না হলে জগৎপতির দর্শন হোত না, আমার সঙ্গীরা না ছাড়লে এ প্রত্যক্ষ অনুভূতি হোত না। সঙ্গীদের আশীর্বাদ করলাম।''

এইভাবে ঘটনার পর ঘটনা। তাঁর কেদারবদরী দর্শনলাভও। বদরীনাথে থাকা ও খাওয়াদাওয়ার সুব্যবস্থাও হয়ে যায়। সেখানে কয়েকদিন তীর্থবাসও করেন। যাত্রীদের কাছে যথেষ্ট অর্থভিক্ষাও পান্।—এইবার কাশীতে ফেরবার কথা। কিন্তু, ঠিক করেন, হাতে যখন টাকা এসে গেল, ঘুরে যাই মথুরা বৃন্দাবনেও।

সেইমত চলে যান। বৃন্দাবনেও খাওয়াদাওয়ার অভাব হয় না। পরম আনন্দে দিন কাটে। কেদারবদরীর দুর্গম যাত্রার পর শ্রান্ত দেহ শুধু বিশ্রামই পায় না, পশ্চিমের জলহাওয়ায় তাঁর স্বাস্থ্যও ফেরে।

অবশেষে কয়েকমাস পরে একদিন কাশীতে ফিরে আসেন। হাতে তখনও ১৷৵—যে-টাকা সম্বল করে তাঁর যাত্রা শুরু।

ওদিকে কিন্তু তাঁকে দেখে কাশীর সবাই অবাক! তার ওপর তাঁর শরীরও অমন মোটাসোটা! একী!

লেখিকা তখন শোনেন কাশীবাসিনী সহযাত্রীরা ফিরে এসে রটনা করেছেন, পথে ঘোরতর অসুস্থ হয়ে সেই তীর্থপথেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে!

শুধু এই নয়। আরও জানতে পারেন, সেই সব সহযাত্রীরা ফিরে এসে অনেকেই পেটের রোগে ভুগছেন এবং এখন অস্থিসার হয়েছেন!

লেখিকারও তখন মনে পড়ে, হরিদ্বারে যাত্রারম্ভে ভোলাগিরি মহারাজের সেই সহাস্য মন্তব্য,—টাকাওয়ালা আপ্ আপ্ খায়ে খায়ে হাগ্ হাগ্ আয়েগী। তুই হালুয়া পুরী লাড্ডু খায়ে এত্তা গোদ্

মোটা হোগী!

কিন্তু, এ তো হোল লেখিকার নিজের কাহিনী। সেই সঙ্গে তিনি যাত্রাপথেরও নানান্ বর্ণনাও দিয়েছেন। অন্যান্য যাত্রীদের সম্বন্ধেও লিখেছেন। তার মধ্যে এক চটিতে যে বিশেষ একটি ঘটনার বিবরণ দেন, তা' প্রকৃতই ভাল উপন্যাস রচনার বিষয়বস্তু হবার যোগ্য।

সেই ঘটনারও আমার যা মনে আছে, এখন শোনাই।

গরুড় চটির ধর্মশালা।

হৃষীকেশের সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা এসে আশ্রয় নিয়েছেন। পাশেই অপর এক গেরুয়াবাস সাধুর দল। সেখানে তাঁদের গুরুদেব—বয়স্ক সন্ন্যাসী—শুয়ে বিশ্রামরত। যুবক শিষ্যরা তাঁর পদসেবা করেন। দেখা যায়, সেই প্রবীণ স্বামিজী বার বার সন্ন্যাসিনীদলের দিকে কাকে যেন তাকিয়ে দেখেন। তারপর তাঁদের মধ্যে একজনকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করেন, কে? সুশীলা না? আশ্চর্য! তোমার এমন মনের বল ও সাহস হয়েছে! এইভাবে ঘরের বার হতে পেরেছ? তুমি যে খুবই ভীরু ছিলে!—তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠে জানান, তোমাকে দেখে ভারী খুশি হচ্ছি।

হৃষীকেশবাসিনী সেই সন্ন্যাসিনীও স্তম্ভিত হয়ে তাঁর সঙ্গিনীদের বলে ওঠেন, ওগো! এ যে দেখছি, আমার স্বামী এসেছেন!

সন্ন্যাসিনীরা হেসে ওঠেন। ঠাট্টা করেন, গেরুয়া দেখে দলে ভিড়তে ইচ্ছে হলো বুঝি? কখনো তো বল নি, তোমার স্বামী আছে। অনেক দিন হোল সন্ন্যাস নিয়েছ, মাথা মুণ্ডন করেছ, হাতের লোহা ফেলেছ!

প্রবীণ স্বামীজী আগ্রহ করে বলেন, চল আমার সঙ্গে। এখন আর কোন চিন্তার কারণ নেই।

সুশীলা উঠে আসেন। তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করেন।

সাধুজি তখন শিষ্যদের কাছে স্বীকার করেন, উনি তোমাদের গুরুমা। আমার পূর্বাশ্রমের শাদির আওরাত।

তারপর, তাঁদের দুইজনের পূর্বাশ্রমের কাহিনীও শোনা যায়।

সুশীলার বিবাহ হয় ১৩।১৪ বছর বয়সে। স্বামীর নাম—শশীভূষণ, তখন তাঁর বয়স ২১।২২।

সুশীলা সুরূপা নয়,—কালো, বেঁটে। লোকে তাঁকে কুৎসিত বলে। অথচ, শশীভূষণ সুদর্শন, গৌরবর্ণ, অতি সুশ্রী।—সুশীলা বলেন, তাঁরা ভগবানের দাস সন্তান, বিষয়ীগুণ বর্ণিতে চাই না।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বুদ্ধিমান। তবু, সুশীলার মনে সব সময় সংশয়,—স্বামীর অমন রূপ, গুণ,—আমাকে নিয়ে তিনি হয়ত সুখী নন্। অথচ, কোন দিনই কখনও স্বামীর কোন কথায় বা আচরণে তিনি যে অসুখী এমন কিছু প্রকাশ পায না। তবুও সুশীলার সদা সঙ্কোচ বোধ। মনভরা সংশয়। তাঁর কোন আচরণে স্বামী অসন্তুষ্ট না হন,—তাই সতর্ক। সর্বদাই চেষ্টা,—কীসে তিনি সুখ পান, তাঁর দেহ সুখে থাকে।—এই হয়ে ওঠে সুশীলার জপধ্যান ;—সংসারের অন্য কোন কাজে মন থাকে না।

জব্বলপুরে শশীভূষণ অফিসের বড়বাবু হলেন। একটি মেয়ে হোল, কিন্তু মারা গেল। অনেকদিন পরে আবার একটি ছেলে হোল। অথচ, সুশীলার সেই ছেলেকে যত না আদরযত্ন দেখাশুনা, তার চেয়ে বেশি সেবাযত্ন স্বামীকে।

স্বামীর অফিসের বেশভূষা গুছিয়ে শুধু ঠিক করে রাখাই নয়, তাঁকে পরিয়ে দেওয়া, ফিরে এলে নিজে খুলে দেওয়া, বাতাস করা, খাবার তৈরি করে খাওয়ানো,—সারাক্ষণই স্বামীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি। স্বামী আপত্তি জানান, বলেন, অতো করো কেন? বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে - এ আমার ভাল লাগে না,- এতো কোরো না। শুনে সুশীলা কেঁদে আকুল হয়, বলে, এ তো আমার কর্তব্য করি -

এ-সব সত্ত্বেও স্বামী কখনও কোন কঠোর বাক্য বলেন না।

স্বামীর অফিস থেকে ফিরতে দেরী হলে সুশীলা চাকর পাঠিয়ে খোঁজ নেয়। স্বামী ফিরে এলে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করে। উত্তর না পেলে কাঁদতে থাকে। স্বামী তখন হয়ত বলেন, আমি আর কোথাও যাব না নাকি? একদিন না বলে চলে যাই যদি —তখন? —সুশীলা কথা শুনে কেঁদে অস্থির।

স্বামী নিয়মিত যোগ অভ্যাস করেন। সুশীলা পিছন থেকে বাতাস করেন। রাত্রে তেল জল দিয়ে স্বামীর পায়ে মালিশ করে দেন, স্বামী ঘুমালে তবে ঘুমান।

স্বামীর দিকেই সব সময়ে দৃষ্টি, ছেলের প্রতি ততো নয়।

স্বামী কখনো হয়ত বলেন, তোমার এখন ছেলে হয়েছে, তার দেখা-শোনা করো, তোমার আর দুঃখ কী!

সুশীলা বলে ওঠে, ছেলে আমি চাই না।

সুশীলার সেই বাক্যই যেন তার ভাগ্যবিধাতা শোনেন!

ছেলের তখন আড়াই বছর বয়স। প্রবল জ্বর দেখা দিল। ডাক্তার এসে দেখেন। ওদিকে কিন্তু সুশীলার স্বামীসেবার ত্রুটি নেই। অবশ্য ছেলের কাছেও থাকতে হয়। কিন্তু মনে মনে সর্বদাই ভাবনা, স্বামীর বুঝি কোথাও অসুবিধা হোল। তাড়াতাড়িতে করা রান্না হয়ত ভাল হয় নি চাকরে হয়ত সব দেখাশুনা ঠিকমত করছে না।

রাত্রে স্বামীর ঘুম হয় না। হঠাৎ দেখেন, কে পাশে বসে পাখা হাতে হাওয়া করে! কে? সুশীলা! স্বামী আশ্চর্য হয়ে বলেন, তুমি এখানে! যাও ছেলের কাছে যাও, তার কাছে থাক।

সুশীলার মন ওঠে না যেতে। তবু যেতে হয়।

ছেলের অসুখ বেড়ে চলে। স্বামী অফিস থেকে ছুটি নেন্। ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি করেন। তিন-চারজন ডাক্তার এসে দেখেও যান্। গরমের দিন। স্বামী ঘরের একপাশে চুপ করে এসে বসেন। গা বেয়ে ঝর্ঝর্ করে ঘাম ঝরে। সুশীলা ছেলের পাশ থেকে উঠে গিয়ে এক গেলাস সরবৎ করে আনেন। স্বামীর গায়ের ঘাম মুছে দেন্। বাতাস করতে বসেন। স্বামী বলেন, তুমি পাগল হয়েছ নাকি সুশীলা? ছেলের কিরকম বাড়াবাড়ি চলেছে, বুঝছ না? সরবৎ আমি খাব না, নিয়ে যাও তুমি। আমি এখন আবার চললাম—সায়েব ডাক্তার আনতে। তুমি যাও—ছেলের কাছে গিয়ে বোসো। এখনি আসছি!

স্বামী খালি গায়ে, খালি পায়ে বেরিয়ে যান্।

সুশীলা আকুলকণ্ঠে ডাকে, ওগো, সরবৎটুকু খেয়ে যাও—একটু সুস্থ হয়ে বার হও।

স্বামী আর ফিরে তাকান না। সুশীলা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে,—সেই রোদে স্বামী চলেছে—চলেছে—চলেছে, শুধু গায়ে, খালি পায়ে।

ওদিকে স্বামী অফিসে গিয়ে তাঁর দু-চারজন বন্ধুকে বলেন,

এখনি তোমরা যাও। ছেলের হয়ে এল। সুশীলাকে সান্ত্বনা কোরো। সে পাগল। আমি চললাম। সুশীলাকে তার বাপ-মার কাছে পাঠিয়ে দিও।

চিরবিদায় পত্র লিখে স্বামী চলে গেলেন।

বিকালে এসব ঘটনা। সন্ধ্যার সময় ছেলেরও শেষ নিঃশ্বাস। সুশীলার কেবলি কান্না—বাবু সায়েব ডাক্তার আনতে গেছে,—কই! কই! এখনো এল না··· কিছুই খেয়ে যায় নি!

সুশীলাকে পাগল অবস্থায় তাঁর বাবা নিয়ে যান। বছর তিনেক সে উন্মাদ ছিল। তারপর কাশীবাস করে। পিতা মাসহারা পাঠাতেন। আরও তিন বছর পরে সুশীলা হরিদ্বার চলে যায়। সেখানে কিছুদিন পরে শাঁখা লোহা ফেলে শংকরাচার্য মঠে সন্ন্যাস নেয়। নাম হয়, নারায়ণগিরি। এখন হৃষীকেশে মাটি ও পাথরের কুটির তুলে তপস্যা করে। কালীকমলী ছত্রের ভিক্ষায় দিন চলে।

এখন তেরো বছর পরে এই তীর্থপথে তাঁদের আবার দেখা!

স্বামিজীর শিষ্যরা এসে সন্ন্যাসিনী সুশীলাকে প্রণাম করে। বলে, চলুন মায়ীজি, গুজরাটে আমাদের মঠে, আমরা আপনার দাস।

স্বামিজীও বলেন, আমার সঙ্গে চল। আর চিন্তা নেই। তোমার জন্যে ভিন্ন আশ্রম করে দেব। কোন অসুবিধে হবে না তোমার।

সুশীলা স্বামিজীর পদসেবা করে। চোখে তার জল। স্থির কণ্ঠে জানায়, যে ফাঁকি দিয়ে যায়, তাকে আর চাই না। যাঁকে ডাকলেই আনন্দ পাই, তাঁকেই এখন পেয়েছি,—আর কপটের সেবায় বাসনা নেই—চোখ দিয়ে তার জল ঝরে পড়ে।

সুশীলা বলে, আমার চোখের এ জল মায়ার কান্নার নয়। জগৎপতিকে সর্বদা প্রার্থনা জানিয়েছি. একবার শুধু তাঁকে দেখাও। —আমাকে না বলে চলে গেল! জিজ্ঞাসা করব, কেন? কেন আমাকে বলে গেল না? এখনি আসছি বলে চলে গেল,—আমি অপেক্ষায় রইলাম,—কেন না বলে ওভাবে চলে গেল?—শুধু একবার যেন তাঁকে দেখাও।—আজ আমার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করলেন আমার আরাধ্য দেবতা,—তাই আমার এই আনন্দের অশ্রু!

স্বামিজী ও শিষ্যরা আবার অনুরোধ করেন, গুজরাটে তাঁদের আশ্রমে গিয়ে বাস করতে।

সুশীলা বলে, আমি এখন বিশ্ব-স্বামীর কৃপা পেয়েছি। সাধারণ শরীর-সেবার আগ্রহে উন্মাদ হয়ে ছিলাম,—আজ মনের কল্পতরু দর্শন করলাম। তেরো বছর যে-বাসনা প্রাণে ধারণ করেছি—তাঁরই দর্শন পেয়েছি। আপনি আপনার পথে যান্, আমিও আমার পথ পেয়েছি।

তারপর ?

সেই স্বামিজী কেদারবদরী দর্শন করে ফিরছেন, সন্ন্যাসিনী সুশীলা নারায়ণগিরি দর্শনে চলেছেন। দুইজন নিজ নিজ পথে যাত্রা করেন।

———